দুর্নীতি, দুঃশাসন, সন্ত্রাস, মাদকমুক্ত উন্নত ও কল্যাণরাষ্ট্র গড়তে

নির্বাচনী ইশতেহার-২০১৮

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

দুর্নীতি, দুঃশাসন, সন্ত্রাস, মাদকমুক্ত

উন্নত ও কল্যাণরাষ্ট্র গড়তে

নির্বাচনী ইশতেহার ২০১৮
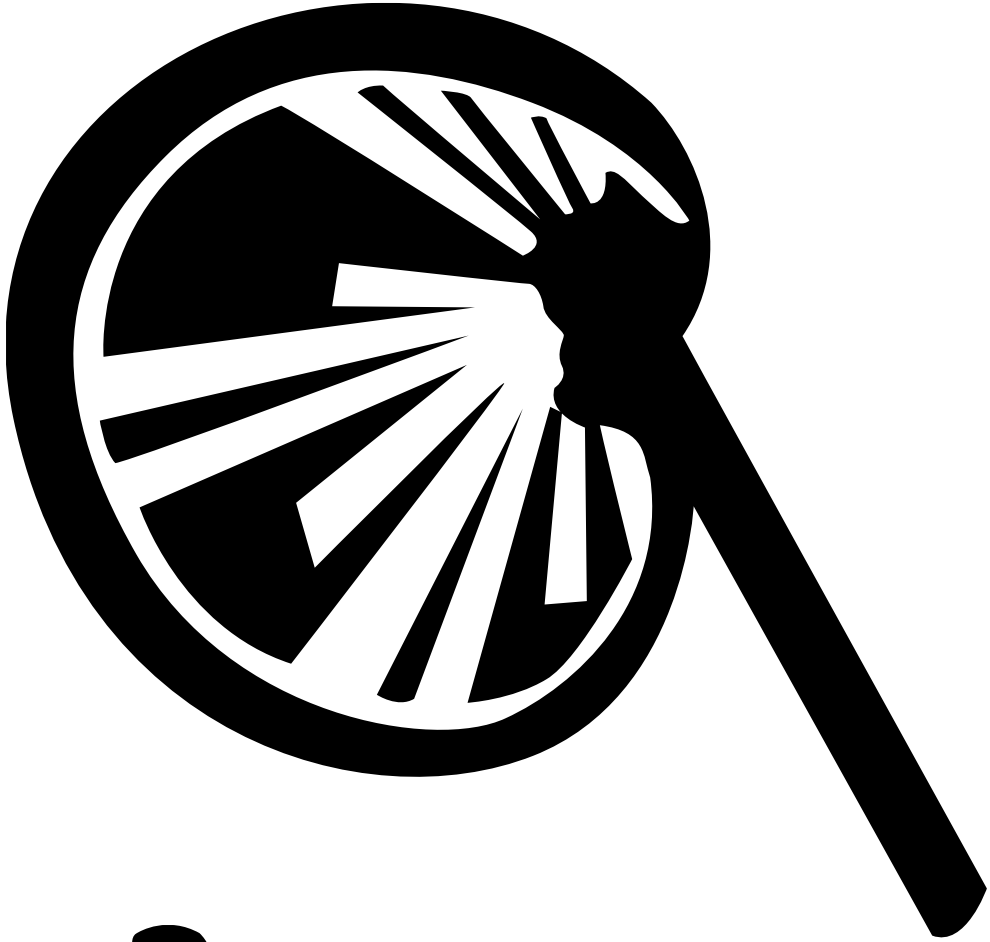
ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ

সূচিপত্র

১. অগ্রাধিকার ভিত্তিক কর্মসূচি

১. কল্যাণরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় রাজনীতিতে গুণগত পরিবর্তন আনা হবে।

২. শুধু দুর্নীতি-সন্ত্রাস দমন নয়; নির্মূলকরণ কর্মসূচিও গ্রহণ করা হবে।

৩. শুধু আইনের শাসন নয়; ন্যায়ের শাসনও প্রতিষ্ঠা করা হবে।

৪. জনমতের যথার্থ প্রতিফলন, সুষ্ঠু নির্বাচন ও কার্যকর সংসদ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সংসদ নির্বাচন পদ্ধতির আমূল সংস্কার করা হবে। First Past The Post (FPTP) এর পরিবর্তে Proportional Represenation (PR) পদ্ধতি প্রবর্তন করা হবে।

৫. মানুষের সার্বিক কল্যাণ প্রতিষ্ঠায় ধর্ম ও রাজনীতির সমন্বয় করা হবে।

৬. দুর্নীতিবাজ, সন্ত্রাসী, খুনি ও অনৈতিক পেশার সাথে জড়িতদের রাজনীতিতে নিষিদ্ধ করা হবে।

৭. নির্বাচনে মনোনয়নের ক্ষেত্রে সৎ, যোগ্য ও চরিত্রবান প্রার্থীদের বিবেচিত করা হবে।

৮. কৃষি ও শিল্পবিপ্লব ঘটিয়ে বেকার ও দারিদ্র্যমুক্ত এবং অর্থনৈতিক সমৃদ্ধশালী দেশ গড়ে তোলা হবে।

৯. খুন, গুম, মিথ্যা ও গায়েবী মামলা, জুলুম, নির্যাতন ও দুঃশাসনের কবল থেকে দেশের মানুষকে মুক্ত করা হবে।

১০. জনগণের বাক-স্বাধীনতা এবং গণমাধ্যমের সকল স্বাধীনতা নিশ্চিত করা হবে।

১১. সকল শ্রেণী, পেশা ও সম্প্রদায়ের মানুষের ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠার সাথে সাথে তাদের সঠিক দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনেও উদ্বুদ্ধ করা হবে।

১২. নারীদের শুধু সমঅধিকার নয়; অগ্রাধিকার প্রতিষ্ঠা করা হবে।

১৩. শিল্পোদ্যোক্তাদের প্রয়োজনীয় ঋণ, গ্যাস, বিদ্যুৎ, পানি, স্যুয়ারেজ, আমদানী-রফতানী কার্যক্রমে ওয়ানস্টেপ সার্ভিস কর্মসূচি গ্রহণ করে স্বল্প সময়ের মধ্যে সবকিছু সম্পন্ন করা হবে।

১৪. সকল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে জাতীয়করণ করা হবে।

১৫. সড়ককে নিরাপদ করার জন্য প্রয়োজনীয় সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

১৬. বাংলাদেশকে ১৫ বছরের মধ্যে উন্নত ও কল্যাণরাষ্ট্রে পরিণত করা হবে।

২. পটভূমি

আমরা মহান আল্লাহ’র শুকরিয়া আদায় করছি, যিনি আমাদেরকে সৃষ্টির সেরা আশরাফুল মাখলুকাত হিসেবে সৃষ্টি করছেন। যিনি আমাদেরকে তাঁর খলীফা বা প্রতিনিধির মর্যাদা দান করেছেন। যিনি আমাদের জীবনকে সুন্দর, সফল ও সার্থক করে গড়ে তোলার জন্য কালজয়ী আদর্শ ইসলামকে মনোনীত করেছেন।

দরূদ ও সালাম সর্বশেষ এবং সর্বশ্রেষ্ঠ নবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি যিনি মানবজাতিকে অন্ধকার থেকে আলোর পথের দিশা দিয়েছেন। যিনি মানবজীবনের সকল স্তরে একটি সর্বোত্তম আদর্শ রেখে গেছেন। যার অনুসরণে মানবজীবন ধন্য ও উন্নত হয়। অনাবিল শান্তি ও কল্যাণ প্রতিষ্ঠা হয় সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনের সর্বস্তরে।

আমরা আরও শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি যাদের আত্মত্যাগের বিনিময়ে স্বাধীনতা পেয়েছি। বিজয় অর্জন করেছি ১৯৭১ সালের এ ডিসেম্বর মাসেই।

ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ গঠনের প্রেক্ষাপট সম্পর্কে প্রথমে দুটি কথা বলতে চাই। ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ এদেশের রাজনৈতিক অঙ্গনে একটি ব্যতিক্রমধর্মী নাম। এটি গতানুগতিক কোনো রাজনৈতিক দল নয়। যেনতেনভাবে ক্ষমতায় যাওয়া এবং ক্ষমতায় টিকে থাকাই এর উদ্দেশ্য নয়। এর উদ্দেশ্য হলো দেশের স্থায়ী শান্তি ও মানবতার সার্বিক মুক্তির লক্ষ্যে গণমানুষের সমর্থন নিয়ে দেশের প্রচলিত রাজনীতির গুণগত পরিবর্তন ঘটিয়ে দুর্নীতি, দুঃশাসন, সন্ত্রাস, মাদকমুক্ত উন্নত ও কল্যাণরাষ্ট্র হিসেবে আমাদের এ প্রিয় দেশকে গড়ে তোলা।

এ লক্ষ্যে আশির দশকের শেষদিকে দেশ, জাতি ও মানবতার এক যুগসন্ধিক্ষণে দেশের রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক অঙ্গনে যখন মারাত্মক ধ্বস নেমেছিল। পচন ধরেছিল সমাজের সর্বস্তরে। জাতির মধ্যে দেখা দিয়েছিল চরম হতাশা ও অনিশ্চয়তা। রাজনৈতিক নেতাদের মধ্যে হিতাহিত জ্ঞান প্রায় লোপ পেতে বসেছিল। রাজনীতিবিদদের ওপর থেকে মানুষ আস্থা ও ভক্তি হারিয়ে ফেলেছিল। রাজনীতি মানুষের কল্যাণ এবং দেশের উন্নয়নের পরিবর্তে রাজনীতিবিদদের কল্যাণ ও উন্নয়নই মুখ্য উদ্দেশ্যে পরিণত হয়েছিল। দেশ শাসনের নামে দুঃশাসনের তাণ্ডবে মানুষের নাভিশ্বাস উঠেছিল। জালেমের জুলুমে এবং মজলুমের আর্তনাদে আকাশ-বাতাস কম্পমান হয়ে উঠেছিল। মানুষের মৌলিক অধিকার চরমভাবে ভুলূণ্ঠিত হয়ে পড়েছিল। দেশ জাতি মানবতা ও রাজনীতির এ দুরবস্থা দেখে তৎকালীন সময়ে যে মানুষটি পেরেশান হয়ে পড়েছিলেন, তিনি হলেন হযরত মাওলানা সৈয়দ মুহাম্মদ ফজলুল করীম (রহ.)।

তিনি ছিলেন একাধারে একজন হক্কানী আলেম এবং ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক নেতা। অপরদিকে তিনি ছিলেন অন্যায়-অবিচার, জুলুম, নির্যাতনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী ও বলিষ্ঠ কণ্ঠস্বর। তিনি মিথ্যার সাথে

কখনও আপস করেননি, অন্যায়ের কাছে মাথানত করেননি, জালিমের সাথে কখনো আঁতাত করেননি। তিনি চিন্তা করলেন রাজনৈতিক নিপীড়ন, অর্থনৈতিক শোষণ, সাংস্কৃতিক গোলামী থেকে দেশের মানুষকে কিভাবে মুক্ত করা যায়। এ লক্ষ্যে তিনি দেশের বরেণ্য ওলামায়ে কেরাম, পীর মাশায়েখ এবং দীনদার বুদ্ধিজীবী, আইনজীবী ও শিক্ষাবিদদের নিয়ে দীর্ঘ পরামর্শক্রমে **১৯৮৭** সালের **১৩**ই মার্চ গঠন করলেন 'ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ'।

রাজনীতিতে নেমেই তিনি গুরুত্বপূর্ণ কিছু উক্তি করলেন, যা চিরাচরিত রাজনৈতিক ধারাকেই পাল্টিয়ে দিল। তার বক্তব্যে সাংবাদিকদের রিপোর্টও পাল্টে গেল। তিনি সকল মহলে অল্পদিনের মধ্যে একটি অভূতপূর্ব সাড়া জাগাতে সক্ষম হয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন– 'ক্ষমতার মোহ-ই হল সকল সন্ত্রাসের মূল।' 'ধর্মহীন রাজনীতি শোষণের হাতিয়ার।' 'শুধু নেতা নয়, নীতিরও পরিবর্তন চাই।'

শুধু ক্ষমতাপ্রেমিক হলে দেশ ও মানুষের সেবা করা যায় না। দেশ ও মানুষের সেবা করতে হলে অবশ্যই দেশপ্রেমিক হতে হবে। এজন্য ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ একটি ব্যতিক্রমধর্মী দল। যেখানে দেশ, জাতি ও মানুষের কোন স্বার্থ নেই, কোন কল্যাণ নেই, সেখানে ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশও নেই। তিনি আরও ঘোষণা করলেন– আত্মশুদ্ধি ছাড়া কেউ মানুষের কল্যাণে ও দেশের উন্নয়নে রাজনীতি করতে পারে না।

হযরত মাওলানা সৈয়দ মুহাম্মদ ফজলুল করীম (রহ.)-এর দেখানো পথ ধরে, হযরত ওলামায়ে কেরাম ও সকল শ্রেণী-পেশার মানুষের সমর্থন ও অংশগ্রহণে এবং নিষ্ঠাবান নেতা-কর্মীদের ত্যাগ ও কুরবানীর বিনিময়ে মহান রাব্বুল আলামীনের অশেষ মেহেরবানীতে সংগঠনটি গোটা বাংলাদেশে একটি মজবুত গণভিত্তির ওপর দাঁড়াতে সক্ষম হয়েছে।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার অশেষ শুকরিয়া, আমাদের মরহুম আমীরের ইন্তেকালের পর তাঁর রেখে যাওয়া আদর্শ ও কর্মসূচিকে আঁকড়ে ধরে সারাদেশের নেতা-কর্মী ও সমর্থকদের মাঝে ঐক্য, সংহতি, সক্রিয়তা, ত্যাগ ও কুরবানী আরও বৃদ্ধি পেয়েছে। গণমানুষের মাঝে আন্দোলনের গ্রহণযোগ্যতা ও জনপ্রিয়তা দিন দিন বেড়েই চলেছে। দেশপ্রেমিক এবং শান্তি ও মুক্তিকামী জনতার মাঝে আন্দোলনের ব্যাপারে ব্যাপক আগ্রহ সৃষ্টি হয়েছে। জনগণের একটি বিপুল অংশ আমাদের আন্দোলনকে কেন্দ্র করে আশাবাদী হয়ে উঠেছেন। এবং সমাজ পরিবর্তনের একটি স্বপ্ন দেখছেন।

ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ আজ হাতপাখা প্রতীক নিয়ে দুর্নীতি, দুঃশাসন, সন্ত্রাস, মাদকমুক্ত, উন্নত ও কল্যাণরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করেছে। পাশাপাশি সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থার আমূল পরিবর্তনের ঘোষণা দিয়ে একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ২৯৯টি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে। আমি নির্বাচনী ইশতেহার ঘোষণার পূর্বে আমূল পরিবর্তনের প্রেক্ষাপট সম্পর্কে কিছু ব্যাখ্যা দেওয়া প্রয়োজন মনে করছি।

২.১ কল্যাণরাষ্ট্র ও অকল্যাণরাষ্ট্র

মানুষের কল্যাণ, নিরাপত্তা, উন্নয়ন ও অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য মানবসমাজে যতগুলো সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে, তন্মধ্যে রাষ্ট্রব্যবস্থাই হল সর্বোত্তম কার্যকর পদ্ধতি। কিন্তু রাষ্ট্র থেকে সত্যিকারের কল্যাণ এবং কাম্যমানের উন্নয়ন রাষ্ট্রশাসক এবং রাষ্ট্র পরিচালনার নীতি বা সংবিধানের ওপর নির্ভরশীল। রাষ্ট্র পরিচালনার নীতি ও রাজনৈতিক নেতৃত্বের মান যত উন্নত হয়, দেশও তত উন্নত হয় এবং জনগণও এর সুফল পেয়ে ধন্য হয়। শাসনক্ষমতা একটি শক্তি, যা সকল অপশক্তিকে পরাভূত করে মানবজীবনকে সুন্দর, সফল ও সার্থক করে গড়ে তুলতে পারে। রাষ্ট্রের শক্তিকে যদি একটি অস্ত্রশক্তির সাথে তুলনা করা হয়, তাহলে এভাবে বলা যায়- একটি অস্ত্রের অপব্যবহারের কারণে মানুষের অকল্যাণ এবং যথাযথ ব্যবহারে মানুষের কল্যাণ নিহীত। অস্ত্রটি যদি নিরাপত্তা বাহিনীর হাতে ব্যবহৃত হয়, তাহলে উক্ত অস্ত্রটি মানষের জান-মালের নিরাপত্তা রক্ষায় সহায়ক হয়। আর অস্ত্রটি যদি ডাকাত বা সন্ত্রাসীদের হাতে ব্যবহৃত হয় তাহলে মানুষের জান-মালের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হয়।

তদ্রূপ রাষ্ট্র শাসনের বেলায়ও এ কথাটি প্রযোজ্য। রাষ্ট্রের শাসকবর্গ যদি সৎ, যোগ্য, দেশপ্রেমিক ও আল্লাহভীরু হন, তাহলে তাদের শাসনে দেশের উন্নয়ন ঘটে, মানুষের জান-মালের নিরাপত্তা, মানবাধিকার, ভোটাধিকার, সুশাসন ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠাসহ দেশ একটি কল্যাণময় রাষ্ট্রে পরিণত হয়। মানুষের জীবনে ফিরে আসে অনাবিল শান্তি, স্বস্তি, নিরাপত্তা ও কল্যাণ। এ ধরণের শাসকবর্গের সাথে জনগণের একটি আত্মিক সম্পর্ক গড়ে ওঠে। জনগণ ও সরকার হয়ে ওঠে একে অপরের পরিপূরক।

অপরপক্ষে রাষ্ট্রক্ষমতা যদি অসৎ, অযোগ্য, দুর্নীতিবাজ, সন্ত্রাসী, কালো টাকার মালিক ও দুর্বৃত্তদের হাতে থাকে, তাহলে এ ধরণের রাষ্ট্রক্ষমতা থেকে জনগণের অকল্যাণ, অশান্তি, দুঃখ-দুর্দশা দিন দিন বাড়তেই থাকে। অসৎ-অযোগ্য শাসকের কারণে দেশ-বিদেশে দেশের ভাবমর্যাদা চরমভাবে ক্ষুণ্ন হয়। সৎ, যোগ্য নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য সঠিক নীতি দরকার। সঠিক নীতি ছাড়া সৎ এবং যোগ্য নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। একটি প্রবাদ আছে– 'শাসক জনগণকে শাসন করে আর নীতি শাসন করে শাসককে।' রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি যদি সঠিক এবং বাস্তবসম্মত না হয় এবং শাসকবর্গ যদি সৎ, যোগ্য এবং আল্লাহভীরু না হন, তাহলে দেশের যে কত দূরবস্থা হয়, রাজনৈতিক অঙ্গন যে কত ভয়াবহ হয়, মানুষের জীবন যে কত দূর্বিষহ হয়, এর বাস্তব নিদর্শন হল আমাদের দেশের চলমান রাজনৈতিক দূরবস্থা এবং রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের বিভিন্ন অনৈতিক কর্মকাণ্ড, যা স্বাধীনতার পর থেকে বিভিন্ন পেক্ষাপটে নগ্নভাবে প্রকাশ পেয়ে আসছে। রাজনৈতিক অঙ্গন হয়ে পড়েছে দুষিত, বিষাক্ত, কুলষিত এবং নোংরা। যার নগ্ন ছোবলে মানবজীবন আজ ক্ষত-বিক্ষত। এ কারণে স্বাধীনতার ৪৭ বছর পরও দেশ শাসনের সঠিক কোন পদ্ধতি গড়ে ওঠেনি। পদ্ধতি যা গড়ে উঠেছে তা অত্যন্ত বিভীষিকাময়, হৃদয়বিদারক, ভয়ঙ্কর, জংলী ও বর্বর প্রকৃতির।

২.২ স্বাধীনতার ৪৭ বছর

স্বাধীনতার ৪৭ বছরে মানুষের ভাগ্যবদলের দোহাই দিয়ে, দূর্নীতি ও সন্ত্রাসমুক্ত দেশের কথা বলে, শান্তিময় জীবনের প্রতিশ্রুতি দিয়ে এ দেশে অনেক নেতার পরিবর্তন, দফার পরিবর্তন ও সরকার কাঠামোর পরিবর্তন হয়েছে। কখনও রাষ্ট্রপতিশাসিত সরকার, কখনো সংসদীয় পদ্ধতির সরকার, কখনও সামরিক সরকার, কখনও তত্ত্বাবধায়ক সরকার, কখনওবা সেনাসমর্থিত তত্ত্বাবধায়ক সরকার দেশ শাসন করেছে। এছাড়া বাংলার অনেক রূপের পরিবর্তনের কথাও এদেশের মানুষ শুনেছে– কখনও সোনার বাংলা গড়ার স্বপ্নে জাতিকে মোহিত করা হয়েছে। কখনও সবুজ বাংলা গড়ার আশ্বাস দিয়ে জাতিকে বিভোর করা হয়েছে। কখনওবা নতুন বাংলা গড়ার কথা বলে জাতিকে চমক দেখানোর চেষ্টা করা হয়েছে। বাংলার সকল রূপের কথা দেশের প্রেক্ষাপট থেকে হারিয়ে গেছে। এখন শুরু হয়েছে ডিজিটাল বাংলার উল্লাস। অনেক আন্দোলন, সংগ্রাম, হরতাল, ঘেরাও-অবরোধ হয়েছে। এতকিছুর পরও কি মানুষের ভাগ্যের কোন পরিবর্তন হয়েছে? এতকিছুর পরও কি উন্নয়ন-উৎপাদনের সুস্থ কোন রাজনৈতিক ধারা এবং সঠিক ও কল্যাণময় দেশশাসনের কোনো পদ্ধতি গড়ে উঠেছে? মানুষের মৌলিক অধিকারসহ ভোটাধিকার কি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে? মানুষের জান-মালের নিরাপত্তা কি নিশ্চিত হয়েছে? দুর্নীতি-সন্ত্রাস কি কমেছে?

আদৌ নয়; বরং দুর্নীতি, দুঃশাসন, সন্ত্রাস জ্যামিতিক হারে বেড়েই চলেছে। ক্ষমতার অপব্যবহার করে ক্ষতাসীনরা দু'হাতে দেশের টাকা লুটপাট করে আঙ্গুল ফুলে শুধু কলাগাছই হয়নি; বটগাছ হয়েছে। লুটপাটের টাকা দেশে রাখা নিরাপদ নয় মনে করে দুর্নীতিবাজ এবং লুটেরারা বিদেশে অঢেল টাকার পাহাড় গড়ে অর্থনীতির মেরুদণ্ড ভেঙ্গে দিয়েছে। এছাড়াও তারা M.M 2nd Home (Malaysia My Second Home), কানাডায় বেগম বাজার এবং সুইচ ব্যাংকসহ বিভিন্ন দেশে অঢেল টাকা জমা করেছে।

এর ফলে দেশে ধনী-গরিবের বৈষম্য বেড়েছে ব্যাপক হারে। ধনী পরিবারের আয় এর ফলে দেশে ধনী-গরিবের বৈষম্য বেড়েছে ব্যাপক হারে। ধনী পরিবারের আয় বৃদ্ধির কারণে শীর্ষ ১০ ভাগ মানুষ দেশের ৩০% সম্পদের মালিক। অপরদিকে নিম্নআয়ের ১০% অতি দরিদ্র জনগোষ্ঠী দেশের মাত্র ১% সম্পদের মালিক। ধনী-গরীবের এই বৈষম্য দেশের সকল গরীব মানুষের মৌলিক চাহিদা খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, চিকিৎসা, শিক্ষা পূরণের বিষয়টি চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন করে তুলেছে।

২.৩ ক্ষমতাসীনদের রাজনৈতিক অবক্ষয়

যারা জনগণের সম্পদ আত্মসাৎ করে এবং বিদেশে পাচার করে তারা দেশ, জাতি ও মানবতার শত্রু। মূলত তারা মানবতাবিরোধী অপরাধী এবং রাষ্ট্রদ্রোহী। তাদের রাজনীতি করার কোন অধিকারই থাকতে পারে না। যারা জনগণের সম্পদ লুট করে, তারাই আবার ক্ষমতা পেলে জনগণের ভোটাধিকারও হরণ করে। জনগণের সম্পদ আত্মসাৎ করে সম্পদের পাহাড় বানানোর একটি সুবর্ণ সুযোগ হলো ক্ষমতা। ক্ষমতা হলো অনুপার্জিত অর্থ উপার্জনের একটি মহাসুযোগ। এজন্য একদল যেকোনভাবে ক্ষমতায় যাওয়া এবং আরেক দল যেকোনভাবে ক্ষমতায় টিকে থাকার জন্য মরিয়া হয়ে ওঠে। এ কাজে তারা সর্বশক্তি ব্যয় করে।

ক্ষমতার মাধ্যমে যা ইচ্ছে তাই করা যায়। একই ধরনের মামলা ক্ষমতাসীনরা রাজনৈতিক মামলা বলে তুলে নেয় এবং বিরোধী দলকে ঐ মামলায় ফাঁসানো হয়। এ অবস্থার আমূল পরিবর্তন দরকার। আমূল পরিবর্তন না হলে আমরা কোনোদিন সভ্য জাতি হিসেবে গড়ে উঠতে পারবো না, পারবো না বিশ্বের দরবারে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে। রেখে যেতে পারবো না নতুন প্রজন্মের জন্য কোন আদর্শ। পারবো না প্রতিহিংসার রাজনীতির অবসান ঘটাতে। পারবো না একটি কার্যকর সংসদ বানাতে। দেশপ্রেমিক, শান্তিকামী ও মুক্তিকামী মানুষের সামনে সুযোগ এসেছে একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে যারা রাজনীতিকে কলুষিত করেছে, ভোটের মাধ্যমে তাদেরকে রাজনৈতিকভাবে প্রত্যাখান করার।

২.৪ আশ্চর্যজনক ৯টি অনৈতিক বিষয়ের চরম উন্নয়ন

রাজনীতি ও দেশশাসনের যে সংস্কৃতি গড়ে উঠেছে, তা একটি সভ্যজাতির জন্য আদৌ গ্রহণযোগ্য নয়। এটি হল বর্বরযুগের গোত্রীয় সংঘাতের আদলে দলীয় সংঘাত। হানাহানি ও মারামারির সংস্কৃতি। প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করার সংস্কৃতি। রাজনৈতিক অঙ্গনে কোনো সুস্থ এবং সঠিক ধারা সৃষ্টি না হওয়ায় স্বাধীনতা-পরবর্তী যারাই ক্ষমতায় এসেছে, তারা ৯টি অনৈতিক বিষয়ের চরম উন্নয়ন ঘটিয়েছে! অনৈতিক বিষয়গুলো হলো–

১. দুর্নীতি।
২. সন্ত্রাস।
৩. মানবাধিকারসহ ভোটাধিকার হরণ।
৪. বেকারত্ব।
৫. জাতীয় চরিত্র ধ্বংস।
৬. ক্ষমতাসীনদের সম্পদের চরম উন্নয়ন।
৭. জাতীয় অনৈক্য ও সংঘাত।
৮. রাজনীতির নামে ব্যক্তিস্বার্থ, দলীয়স্বার্থ, কায়েমীস্বার্থ ও স্বৈরতন্ত্র প্রতিষ্ঠা।
৯. স্বাধীন পররাষ্ট্রনীতির পরিপন্থী বিদেশী রাষ্ট্রের তাবেদারির প্রতিযোগিতা।

ক্ষমতার দাপটে এবং রাজনীতিতে কোনো নীতি-নৈতিকতা এবং সুস্থধারা না থাকায় দেশের অবস্থা অত্যন্ত নাজুক অবস্থায় পৌঁছে গেছে। এর ফলে দেশের খেটে খাওয়া মানুষ স্বাধীনতার সুফল আজও ভোগ করতে পারেনি। দেশীয় এবং বিদেশী সংস্থার রিপোর্ট অনুযায়ী যারাই ক্ষমতায় এসেছে, তারাই রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার অপব্যবহার করে চরম দুর্নীতি করেছে। তারা দুর্নীতির সিন্ডিকেট গড়ে তুলেছে। দুর্নীতিকে পাকাপোক্ত ও স্থায়ী করার জন্য সন্ত্রাসবাদ কায়েম করেছে। ক্ষমতাই তাদের সকল দুর্নীতি, লুটপাট ও সন্ত্রাসের দ্বার উন্মুক্ত করে দিয়েছে। এমন কোনো স্তর নেই, এমন কোনো ক্ষেত্র নেই, যেখানে দুর্নীতির থাবা বিস্তার করেনি। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানসহ এমন কোনো প্রতিষ্ঠান নেই, যেখানে দুর্নীতি এবং টেন্ডারবাজীকে কেন্দ্র করে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের তাণ্ডব ঘটেনি। শুধু দলীয় ক্যাডাররাই নয়, প্রজাতন্ত্রের নিরাপত্তার কাজে নিয়োজিত আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকেও ক্ষমতাসীনরা নির্লজ্জভাবে বিভিন্ন অপকর্মে ব্যবহার করেছে। শাসকশ্রেণীর এহেন অপকর্মের এখনই অবসান ঘটাতে হবে, অন্যথায় দেশের অস্তিত্ব হুমকীর মুখে পড়বে।

দুর্নীতি একটি জাতি ও রাষ্ট্রের জন্য মারাত্মক সমস্যা। দুর্নীতি একটি দেশের উন্নয়নের জন্য সবচেয়ে বড় অন্তরায়। দুর্নীতিগ্রস্থ দেশের কোনো ভবিষ্যৎ থাকে না। দুর্নীতি একটি রাষ্ট্রকে ব্যর্থ ও অকার্যকর রাষ্ট্রে পর্যবসিত করে। বিশ্বের দরবারে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারে না। দুর্নীতিগ্রস্থ দেশের মধ্যে কোনো সময়েই রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা ও জাতীয় সংহতি, সুশাসন, ন্যায়বিচার, মানবাধিকার ও ভোটাধিকার প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। দুর্নীতিগ্রস্থ দেশে আইন, বিচার এবং শাসন বিভাগ স্বাধীনভাবে দায়িত্বশীলতার সাথে তাদের দায়িত্ব পালন করতে পারে না। দুর্নীতি বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সুশাসন, ন্যায়বিচার, মানবাধিকার, ভোটাধিকার, রাজনৈতিক অধিকার, সুখ-শান্তি, দেশপ্রেম, নিরাপত্তা ও স্বাধীনতার চেতনা এবং গণতন্ত্রের চেতনাকেও ম্লান করে দিচ্ছে। দুর্নীতিগ্রস্থ দেশের নাগরিকগণ শাসকগোষ্ঠীর কাছে হয়ে পড়ে গুরুত্বহীন। তাই শাসকগোষ্ঠী জনগণের কাছে জবাবদিহিতার কোনো তোয়াক্কা করে না। দুর্নীতিগ্রস্থ দেশের

সরকারগুলো মুখে গণতন্ত্রের কথা বললেও কাজ করে স্বৈরশাসকের মত। দুর্নীতিগ্রস্থ দেশে জণগণের ম্যান্ডেটকে উপেক্ষা করে পেশিশক্তি, কালো টাকা ও ভোট ডাকাতিই হয় ক্ষমতায় যাওয়ার প্রধান হাতিয়ার। এহেন রাজনৈতিক দূরবস্থা থেকে আমাদের রাষ্ট্র ও সমাজ তথা দেশের ১৬ কোটি নাগরিককে মুক্ত করার সুমহান লক্ষ্যেই আমাদের আজ এই আমূল পরিবর্তনের অঙ্গীকার।

২.৫ দুর্নীতির ব্যাপকতা ও বাংলাদেশের অবস্থান

দুর্নীতি আমাদের সব অর্জনকে কিভাবে গ্রাস করেছে, তার কিছু ভয়াবহ চিত্র আপনাদের সামনে তুলে ধরা হলো–

ক. দুর্নীতিতে বাংলাদেশের অবস্থান (১৯৫টি দেশের মধ্যে) :

২০০১ থেকে ২০০৫ সাল পর্যন্ত দুর্নীতিতে বাংলাদেশ ১ম ছিলো।

২০০৬ সালে দুর্নীতির ধারণা সূচকে বাংলাদেশের অবস্থান ছিল ৩য়, ২০০৭ সালে ৭ম,

২০০৮ সালে ১০ম,

২০০৯ সালে ১৩তম,

২০১০ সালে ১২তম,

২০১১ সালে ১৩তম,

২০১২ সালে ১৩তম,

২০১৩ সালে ১৬তম,

২০১৪ সালে ১৪তম,

২০১৫ সালে ১৩তম,

২০১৬ সালে ১৫তম,

২০১৭ সালে ১৭তম।

খ. দুর্নীতির খতিয়ান :

২০১৭ সালের রিপোট অনুযায়ী ৬৬.৫% পরিবার দুর্নীতির শিকার হয়েছে। গড়ে প্রতি পরিবারকে ঘুষ দিতে হয়েছে ৫৯৩০ টাকা। ২০১৭ সালে মোট ঘুষের টাকার পরিমাণ ১০ হাজার ৬৮৮ কোটি ৯০ লক্ষ টাকা। সর্বাধিক দুর্নীতিগ্রস্থ খাত–

পাসপোর্ট - ৬৭.৩%

বিআরটিএ - ৬৫.৪%

বিচারিক সেবা - ৬০.৫%

ভূমি সেবা - ৪৪.৯%

শিক্ষা - ৪২.৯%

স্বাস্থ্য - ৪২.৫%

[তথ্যসূত্র : ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি)]

গ. আর্থিকখাতের কেলেংকারী :

ব্যাংক খাতের অদক্ষতায় ২০১৬-১৭ অর্থবছরেই ক্ষতি হয়েছে ১০ হাজার কোটি টাকা। (দৈনিক সমকাল ৫ এপ্রিল ২০১৮)

খেলাফী ঋণ- ৮৮ হাজার ৫৮৯ কোটি ৩৭ লাখ টাকা।

(দৈনিক যুগান্তর ৫ জুন ২০১৮)

বাংলাদেশ ব্যাংকের রিজার্ভ থেকে চুরি গেছে ৮০০ কোটি টাকা।

(উইকিপিডিয়া)

সোনালী ব্যাংক থেকে জালিয়াতি করে অর্থ আত্মসাতের পরিমাণ তিন হাজার ৬০৬ কোটি ৪৮ লাখ টাকা। এর মধ্যে একা হলমার্কই নিয়েছে দুই হাজার ৬৬৭ কোটি ৪৫ লাখ টাকা। (প্রথম আলো ০৫-০৯-২০১২)

জনতা ব্যাংকের ঋণ কেলেংকারী প্রায় ৫ হাজার কোটি টাকা।

(দৈনিক প্রথম আলো ৫ ফেব্রুয়ারি ২০১৮)

বেসিক ব্যাংকের ঋণ কেলেংকারী সাড়ে চার হাজার কোটি টাকা।

(দৈনিক প্রথম আলো ২৭-০৬-২০১৩)

ঘ. ফ্লাইওভার নির্মানে দুর্নীতি :

মেয়র হানিফ ফ্লাইওভারের প্রতি কিলোমিটার নির্মাণে ব্যয় হয়েছে প্রায় ১৮০ কোটি টাকা।

রাজধানীর মগবাজার-মৌচাক সমন্বিত ফ্লাইওভারের কিলোমিটার প্রতি ব্যয় হয়েছে ১৩৫ কোটি টাকা।

কুড়িল ফ্লাইওভার নির্মাণে ব্যয় হয়েছে ৩০৬ কোটি টাকা।

মিরপুর-বিমানবন্দর সড়কে জিল্লুর রহমান ফ্লাইওভারে কিলোমিটার প্রতি ব্যয় হয়েছে ১০৫ কোটি টাকা।

অপরদিকে কলকাতায় গত বছরের ৯ অক্টোবর মহানগরীর দীর্ঘতম পরমা ফ্লাইওভার উদ্বোধন করা হয়। ৮ দশমিক ১৪ কিলোমিটার দীর্ঘ ফ্লাইওভারে ব্যয় হয়েছে ৩৯২ কোটি টাকা। প্রতি কিলোমিটারে ব্যয় হয়েছে ৪৮ কোটি ১৫ লাখ টাকা।

সম্প্রতি চীনে ১০০ কিলোমিটার দীর্ঘ পাঁচটি ফ্লাইওভার নির্মাণে প্রতি কিলোমিটারে ব্যয় হয়েছে ৫০ কোটি টাকা। মালয়েশিয়ায় ১০ দশমিক ৫ কিলোমিটার দীর্ঘ পাঁচটি ফ্লাইওভার নির্মাণে কিলোমিটারপ্রতি ব্যয় হয়েছে ৫৭ কোটি ৭১ লাখ টাকা। (দৈনিক কালের কণ্ঠ ৩১ মে ২০১৬)

ঙ. রাস্তা নির্মাণে দুর্নীতি :

বাংলাদেশে ১ কিলোমিটার রাস্তা নির্মাণ করতে ব্যয় হয় ৯৪ কোটি টাকা, অথচ একই সময়ে ভারতে ব্যয় হয় ১০ কোটি, চীনে ১০ কোটি আর ইউরোপে মাত্র ২৫ কোটি টাকা।

তথ্যমতে ইউরোপে চার লেনের নতুন সহাসড়ক নির্মাণে কিলোমিটারপ্রতি ব্যয় পড়ছে ২৯ কোটি টাকা। পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতে এ ব্যয় ১০ কোটি টাকা। আর চীনে তা গড়ে ১৩ কোটি টাকা।

তবে বাংলাদেশের ছয়টি চারলেন প্রকল্পের কিলোমিটারপ্রতি গড় নির্মাণব্যয় ৫৪ কোটি টাকা। তার মধ্যে সর্বশেষ নেওয়া ঢাকা-মাওয়া-ভাঙ্গা মহাসড়কের নির্মাণব্যয় কিলোমিটারে ঠেকেছে ১২২ কোটি ৭৭ লাখ টাকায়।

(কালের কণ্ঠ ২১ জুন ২০১৬)

চ. বিদেশে সম্পদ পাচারের খতিয়ান :

২০০৫-২০১৪ সাল পর্যন্ত পাচার হয়েছে ৬ লাখ ৬ হাজার ৮৬৮ কোটি টাকা। যা বাংলাদেশের দুই অর্থবছরের বাজেটের সমান। ২০১৮ সাল পর্যন্ত তা প্রায় ১০ লাখ কোটি টাকা। (দৈনিক ইনকিলাব ১৭ ডিসেম্বর ২০১৭)

সুইচ ব্যাংকে বাংলাদেশের টাকার পরিমাণ ২০% বেড়েছে। অর্থের পরিমাণ ৫ হাজার কোটি টাকা। মালয়েশিয়াতে সেকেন্ড হোম নির্মাণে বাংলাদেশ ৩য় অবস্থানে রয়েছে। (বিবিসি বাংলা ২২ জুলাই ২০১৭)

কানাডায় গড়ে উঠেছে বেগমপাড়া। এখানেও অনেকের বিনিয়োগ আছে।

এছাড়াও বিভিন্ন দেশে অর্থ পাচার করা হয়েছে।

২.৬ দেশ পিছিয়ে থাকার কারণ

যে জাতি মাত্র ৯ মাসে সশস্ত্র যুদ্ধের মাধ্যমে স্বাধীনতা অর্জন করেছে, সেই অদম্য জাতিকে স্বল্পোন্নত দেশ থেকে মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত হতে ৪৭ বছর অপেক্ষা করতে হয়েছে। নীতিহীন ভোগবাদী রাজনীতির কারণেই অদম্য বাঙালি জাতির উন্নয়ন এভাবে ব্যহত হয়েছে। স্বাধীনতার রজতজয়ন্তির প্রাক্কালে দাঁড়িয়ে একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের মুহূর্তে আমরা দুঃখ-ভারাক্রান্ত হৃদয়ে আপনাদের সামনে কিছু বৈশ্বিক প্রতিবেদন পেশ করতে চাই। দেখুন! বিভিন্ন মানদণ্ডে বাংলাদেশ আজ কোথায় দাঁড়িয়ে আছে! অন্য দেশগুলো কতটা এগিয়ে গিয়েছে আর আমরা কতটা পিছিয়ে রয়েছি!

গত ১৭ অক্টোবর ২০১৮ বিশ্বব্যাংক poverty and shared prosperity 2018: piecing together the poverty puzzle শীর্ষক প্রতিবেদন প্রকাশ করে। প্রতিবেদন অনুযায়ী সংখ্যায় চরম দারিদ্র্যে শীর্ষ দেশসমূহের মধ্যে

বাংলাদেশের অবস্থান ৪র্থ। মোট ২ কোটি ৪৪ লক্ষ মানুষ চরম দারিদ্র্যের শিকার। যারা দৈনিক ১৬০-১৮০ টাকাও উপার্জন করতে পারে না।

১০ অক্টোবর ২০১৮ পৰ্টি যৌথভাবে বৈশ্বিক ক্ষুধা সূচক প্রকাশ করে। ১১৯টি দেশ নিয়ে তৈরি করা এই সূচকে বাংলাদেশের অবস্থান ৮৬।

১০ অক্টোবর ২০১৮ বিশ্বব্যাংক প্রথমবারের মতো মানবসম্পদ সূচক প্রকাশ করে। সেখানে বাংলাদেশের অবস্থান ১০৬।

এভাবে বৈষম্য হ্রাস প্রতিশ্রুতি সূচকে ১৮৪ তম। শ্রমিক অধিকার ও বেতন ভাতা ১৪৮তম, বৈশ্বিক প্রতিযোগিতা সক্ষমতা প্রতিবেদন ১০৩ তম।

অন্যদিকে ৫ সেপ্টেম্বর ২০১৮ wuw এর প্রতিবেদন অনুসারে ২০১২ সাল থেকে বিশ্বের সবচেয়ে দ্রুতগতিতে বাংলাদেশে অতিধনী বাড়ছে; যাদের সম্পদ ২৫ কোটি টাকারও বেশি।

১৬ সেপ্টেম্বর ২০১৮ বিশ্বব্যাংকের প্রতিবেদন অনুযায়ী বাংলাদেশে মোট মৃত্যুর ২৭.৭% ঘটছে পরিবেশ দূষণের কারণে।

২৪ মে ২০১৮ বিশ্বব্যাংকের এক প্রতিবেদনে বলা হয়, বিশ্ব সড়ক সুবিধাবঞ্চিতদের তালিকায় বাংলাদেশ ৪র্থ।

এভাবে বিশ্বের সকল নেতিবাচক জরিপে বাংলাদেশ শীর্ষ কাতারে। অন্যদিকে সকল ইতিবাচক জরিপে বাংলাদেশ নিম্নসারিতে। অথচ শক্তি-সাহস, অদম্যতা, শৌর্য-বীর্যে আমরা বিশ্বের সেরা জাতিগুলোর একটি। যা আমরা ৫২ ও ৭১ সালে প্রমাণ করেছি। কিন্তু ভুলনীতি, দুর্নীতিবাজ ও অদক্ষ নেতৃত্বের কারণে আজ আমাদের এই অধঃপতিত অবস্থা।

৩. নাগরিক সুবিধা প্রদান

দুর্নীতির প্রকাশিত এ চিত্র এবং পিছিয়ে পড়া অবস্থা থেকে দেশকে মুক্ত করে, জনগণকে যেসব নাগরিক সুবিধা দেওয়া হবে, তা নিম্নরূপ–

ক. সাধারণ মানুষের জীবনমান উন্নয়নের লক্ষ্যে খাদ্যদ্রব্যের মূল্য ২০% কমানো হবে।

খ. জীবনকে স্বাচ্ছন্দময় করে তোলা এবং শিল্প উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য জ্বালানী তেল, গ্যাস ও বিদ্যুতের দাম স্থিতিশীল রাখা হবে।

গ. মানবিক কারণে রিক্সা, ভ্যান ও ঠেলাগাড়ীর লাইসেন্স ফি মওকুফ করা হবে।

ঘ. বাস, ট্রাক, কাভার্ড ভ্যানসহ সকল গণপরিবহনের লাইসেন্স ফি অর্ধেক করা হবে।

ঙ. জমির খাজনা, সকল ধরনের টোল এবং হোল্ডিং ট্যাক্স অস্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধি করা হবে না।

চ. কৃষকের উৎপাদন খরচ পুষিয়ে নেওয়ার স্বার্থে সার, সেচ ও বীজ অর্ধেক মূল্যে বিতরণ করা হবে।

ছ. শ্রমিকদের জীবনমান উন্নয়নের জন্য শ্রমিকের বেতন দ্বিগুণ করা হবে।

জ. চিকিৎসা সহজলভ্য করার জন্য চিকিৎসার খরচ ৫০% কমানো হবে।

ঝ. সকল সেক্টরের পরিবহনে অযৌক্তিক ভাড়া বৃদ্ধি ও নৈরাজ্য বন্ধ করা হবে।

ঞ. সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে জাতীয়করণ করা হবে।

ট. সকল মসজিদের ইমাম, মুয়াজ্জিন এবং খাদেমকে সম্মানজনক ভাতা দেওয়া হবে।

ঠ. মন্দির, গীর্জা, প্যাগোডাসহ সকল ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের সেবককে সম্মানজনক ভাতা প্রদান করা হবে।

ড. ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হবে এবং লোডশেডিং বন্ধ করা হবে।

ঢ. সর্বত্র আর্সেনিকমুক্ত বিশুদ্ধ পানির ব্যবস্থা করা হবে।

ন. টেকসই ও গ্যারান্টিসহ রাস্তাঘাট এবং সকল অবকাঠামো নির্মান করা হবে।

প. রাস্তা-ঘাট এবং ফেরীতে সকল ধরনের অবৈধ চাঁদা ও টোকেন মানি বাতিল করা হবে।

ফ. বৈদেশিক ঋণ ১৫ বছরের মধ্যে শূন্যের কোঠায় নামিয়ে আনা হবে।

ব. শিক্ষার্থীরা অধ্যয়নকালীন যাতে পুজি সঞ্চয় করে সাবলম্বী হতে পারে, এ লক্ষ্যে সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে স্ট্যুডেন্ট সেভিংস ব্যাংক (SSB) গঠন করা হবে।

ভ. সকল সরকারী কর্মকর্তা-কর্মচারির বেতন-ভাতা যৌক্তিক হারে বাড়ানো হবে।

ম. বাংলাদেশকে ১৫ বছরের মধ্যে উন্নত ও কল্যাণরাষ্ট্রে পরিণত করা হবে।

৪. দুর্নীতি ও সন্ত্রাস শুধু দমন নয়; নির্মূলকরণ কর্মসূচি গ্রহণ

দুর্নীতি সন্ত্রাস একে অপরের সাথে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। দুর্নীতিবাজরা দুর্নীতিকে পাকাপোক্ত করার জন্যই সন্ত্রাসকে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করে। রন্ধ্রে রন্ধ্রে দুর্নীতি একটি ব্যর্থরাষ্ট্রের পরিচয় বহন করে। সর্বত্র সন্ত্রাস ছড়িয়ে পড়া একটি অকার্যকর রাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্যই বহন করে। দুর্নীতি ও সন্ত্রাসের তাণ্ডব থেকে দেশকে রক্ষা করার জন্য দুর্নীতি ও সন্ত্রাস শুধু দমনই নয়; বরং নির্মূলকরণে কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

এ লক্ষ্যে আমাদের কর্মসূচি নিম্নরূপ-

শুধু দুর্নীতি দমন নামে কোন সংস্থা গঠন করলে বা কর্মসূচি গ্রহণ করলেই দুর্নীতি বন্ধ হবে না। কারণ প্রতিকুল পরিবেশে হয়ত দুর্নীতি কিছুটা সাময়িক কমতে পারে কিন্তু দুর্নীতিবাজরা যখন সুযোগ পাবে, তখন আগের চেয়ে অনেক গুণ বেশি দুর্নীতিতে জড়িয়ে পড়বে। এজন্য দুর্নীতি ও সন্ত্রাস শুধু দমন নয়, দুর্নীতি ও সন্ত্রাস নির্মূলকরণ কর্মসূচি গ্রহণ করা হবে।

ক. দুর্নীতি ও সন্ত্রাসের মূল উৎসগুলো চিহ্নিত করে দুর্নীতি ও সন্ত্রাস নির্মূলে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

খ. দুর্নীতিবাজ, সন্ত্রাসী, কালোটাকার মালিক, ঋণ খেলাপী, বিদেশে টাকা পাচারকারীদের রাজনীতিতে অযোগ্য ঘোষণা করা হবে এবং যে দল দুর্নীতি, সন্ত্রাস, কালো টাকা ও পেশীশক্তি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, সেই দলের নিবন্ধন বাতিল করার আইন পাশ করা হবে।

গ. দুর্নীতি-সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে দেশবাসীকে সচেতন করা হবে। এ কাজে সমস্ত প্রচারযন্ত্র, সেমিনার, সিম্পোজিয়াম, মসজিদের ইমাম, আলেম-উলামা, পীর-মাশায়েখসহ অন্যান্য ধর্মীয় নেতাদের সমন্বিত ভূমিকা পালনের জন্য বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে।

ঘ. মানুষের অভ্যন্তরীণ মূল্যবোধকে উন্নত করার জন্য ব্যবহারিক জীবনে ধর্মীয় অনুশাসন মেনে চলার জন্য জনগণের প্রতি নির্দেশনা জারী করা হবে। একজন সত্যিকারের ধার্মিক মানুষ কখনও অন্যের ক্ষতি করে না, দুর্নীতি ও সন্ত্রাসী কার্যকলাপে লিপ্ত হয় না, দেশ ও মানুষের অকল্যাণ চিন্তা করে না।

ঙ. আদর্শ ও দেশপ্রেমিক নাগরিক গড়ার লক্ষ্যে শিক্ষার সর্বস্তরে ধর্মীয় শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা হবে। মানুষের নৈতিকতা রক্ষাকল্পে চরিত্রবিধ্বংসী অপসংস্কৃতি বন্ধ করে সুস্থ কল্যাণধর্মী সংস্কৃতি চালু করা হবে। অনেক বাস্তবসম্মত কারণে দমনমূলক সাজার প্রচেষ্টা অনেক ক্ষেত্রে ব্যহত হয়। এসব কারণেই সন্ত্রাস ও দুর্নীতি দমনমূলক ব্যবস্থাকে যত অল্প সময়ের জন্য সম্ভব একটি অন্তবর্তীকালীন ব্যবস্থা হিসেবে সীমিত রেখে সন্ত্রাস ও দুর্নীতি নির্মূল কৌশলের দিকে বেশি জোর দেওয়া হবে।

চ. জনপ্রতিনিধিসহ সরকারি, বেসরকারি, আধা-সরকারি, স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা/ কর্মচারিদের কারও দুর্নীতি যদি প্রমাণিত হয়, তাহলে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। যাতে অন্য কেউ দুর্নীতি করতে সাহস না পায়। জনপ্রতিনিধি এবং প্রজাতন্ত্রের কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণের দুর্নীতি জনগণের সাথে বিশ্বাসঘাতকতার শামিল। এরপরেও দুর্নীতি থেকে বিরত না হলে, তাদের তিন গুণ শাস্তির বিধান করা হবে। ১ম শাস্তি অপরাধ করার জন্য, ২য় শাস্তি রাষ্ট্রের সাথে ওয়াদাভঙ্গ করার জন্য, ৩য় শাস্তি ক্ষমতার অপব্যবহার করার জন্য।

ছ. 'দুর্নীতি ও সন্ত্রাসকে না বল' এবং 'দুর্নীতি ও সন্ত্রাসকে ঘৃণা কর'– এ বিষয়ে জনমত সৃষ্টির লক্ষে বিভিন্ন মিডিয়ার ব্যাপক প্রচারণা চালানো হবে।

জ. সকল স্তরের জনপ্রতিনিধি, সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারিগণকে দায়িত্ব পালনকালীন সময়ে এবং অবসরকালীন সময়েও দুর্নীতি না করার অঙ্গীকার নেওয়া হবে।

৫. রাজনীতিতে গুণগত পরিবর্তন

এ লক্ষ্যে আমাদের কর্মসূচি-

ক. দেশের সর্বস্তরে অসৎ ও অযোগ্য নেতৃত্ব পরিবর্তন করে, সৎ ও যোগ্য নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করা হবে।

খ. রাজনৈতিক শক্তিই জাতীয় জীবনের সকল দিক নিয়ন্ত্রণ করে বলে এ অঙ্গনকে চরিত্রহীন, দুর্নীতিবাজ, সন্ত্রাসী ও অসৎ নেতৃত্বমুক্ত রাখতে জনমত গড়ে তোলা হবে এবং সকল রাজনৈতিক দলকে এ কাজে উদ্বুদ্ধ করে জাতীয় ঐক্যমত্য গড়ে তোলা হবে।

গ. দুর্নীতিবাজ, সন্ত্রাসী, চিহ্নিত অসৎ চরিত্রসম্পন্ন লোকদেরকে দলে স্থান না দেয়ার অঙ্গীকারে আবদ্ধ হওয়ার জন্য রাজনৈতিক দলসমূহকে উদ্বুদ্ধ করা হবে।

ঘ. নৈতিক শিক্ষা ও ধর্মীয় অনুশাসন বাস্তবায়নের মাধ্যমে জনগণের আত্মিক পরিশুদ্ধিসহ চিন্তা-বিশ্বাস ও কর্মের পরিশুদ্ধি ঘটানো হবে। এর মাধ্যমে নৈতিক মূল্যবোধ উন্নয়নের একটি আবহ সৃষ্টি করা হবে।

ঙ. জনগণের দুঃখ-দুদর্শার জন্য সবচেয়ে বড় কারণ অসৎ ও অযোগ্য নেতৃত্ব। তাই সুশাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সৎ, যোগ্য নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠার কার্যক্রমকে সর্বাধিক গুরুত্ব দেওয়া হবে। এ লক্ষ্যে রাজনৈতিক

নেতৃবৃন্দকে ইসলামের অনুশাসন পালনে উদ্বুদ্ধ করা, আল্লাহর ভয় অন্তরে জাগ্রত করা, আত্মশুদ্ধির প্রশিক্ষণ দান করা, সর্বোপরি অসৎ কাজের জন্য মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন, নিজের বিবেক এবং জনগণের কাছে জবাবদিহিতার অনুভূতি জাগ্রত করা হবে।

৬. কার্যকর সংসদ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে নির্বাচনপদ্ধতির আমূল সংস্কার

সার্বজনীন ভোটাধিকার ও অবাধ-নিরপেক্ষ-গ্রহণযোগ্য নির্বাচনের জন্য বহুদিন ধরে এদেশের মানুষকে সংগ্রাম করতে হয়েছে। পাকিস্তানের আইয়ুবী শাসনামলের প্রায় একযুগ ধরে 'এক লোক এক ভোট', 'প্রত্যক্ষ নির্বাচন' ইত্যাদি দাবিতে দেশবাসীকে রক্ত দিতে হয়েছে। স্বাধীনতা পরবর্তী শাসনকাল জুড়ে 'আমার ভোট আমি দেব, যাকে খুশি তাকে দেব' দাবিতে জনগণকে রক্তঝরা সংগ্রাম করতে হয়েছে। এভাবে সার্বজনীন ভোটাধিকার ও অবাধ-নিরপেক্ষ নির্বাচনের দাবিটি ছিল আন্দোলন সংগ্রামের অন্যতম প্রধান দাবি।

নব্বইয়ের ঐতিহাসিক গণজাগরণের ফলে এরশাদের ক্ষমতার অবসানের পর দেশবাসীর মনে তাই যুক্তিসংগত কারণে আশা জেগেছিল যে, এরপর আর এই দাবিতে সংগ্রাম করার প্রয়োজন হবে না।

কিন্তু জনগণের সেই আশা ধূলিসাৎ হয়েছে। গত আড়াই দশক ধরে পর্যায়ক্রমে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত দুটি দল (আওয়ামী লীগ ও বিএনপি), সার্বজনীন ভোটাধিকার ও অবাধ-নিরপেক্ষ নির্বাচনের ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হয়েছে। শুধু তাই নয় তাদের হাতে নির্বাচনপ্রক্রিয়া একটি প্রহসন ও তামাশায় পরিণত হয়েছে।

জনগণের অবাধ-ভোটাধিকার প্রয়োগ ও ভোটের মাধ্যমে জনগণের প্রকৃত ইচ্ছা ও মতামতের প্রতিফলন নিশ্চিত করাই হলো একটি অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের প্রাথমিক ও মৌলিক পূর্বশর্ত। কিন্তু আমাদের দেশে নির্বাচন জনমতের প্রকৃত প্রতিফলনের পরিবর্তে অর্থ, পেশীশক্তি, প্রশাসনিক কারসাজি ইত্যাদির প্রহসনমূলক প্রতিযোগিতায় পরিণত হয়েছে। এই প্রহসনের খেলা থেকে নির্বাচনব্যবস্থাকে মুক্ত করা এখন জরুরি কর্তব্য। প্রশ্ন হলো, এ কর্তব্য পালনে সুনির্দিষ্ট করণীয় কী?

অবাধ-নিরপেক্ষ নির্বাচন নিশ্চিত করার জন্য কেবল কিছু লোকদেখানো উপরভাসা সংস্কারে আর কাজ হবে না। এজন্য প্রয়োজন গোটা নির্বাচনব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন। এক্ষেত্রে নির্বাচনী এলাকার ভিত্তিতে 'অনেক প্রার্থীর মধ্যে যে সবচেয়ে এগিয়ে থাকবে সে জয়ী হবে' (First Past The Post - FPTP) ব্যবস্থা পরিবর্তন করে 'সংখ্যানুপাতিক প্রতিনিধিত্বমূলক' (Proportional Represenation - PR) ব্যবস্থা চালু করা হবে। পদ্ধতি নিম্নরূপ–

ক. 'সংখ্যানুপাতিক প্রতিনিধিত্ব' তথা PR ব্যবস্থায় জাতীয় সংসদের নিজস্ব এখতিয়ারভুক্ত কাজ-কর্ম সম্পর্কে নীতি-কর্মসূচি-প্রস্তাবনা-পরিকল্পনা ইত্যাদি বর্ণনা করে রাজনৈতিক দলগুলো দেশবাসীর সামনে নিজ নিজ ইশতেহার উপস্থাপন করবে। এসবের মধ্যে ভোটার যেখানে তার ইচ্ছার সর্বোৎকৃষ্ট

প্রতিফলন দেখতে পাবে সেই দলের মার্কায় সে ভোট দেবে। যে দল যত শতাংশ ভোট পাবে, সেই দল সেই হারে জাতীয় সংসদে প্রতিনিধি পাঠাতে পারবে। অর্থাৎ ৩০০ আসনের সংসদে কোনো দল ৫০% ভোট পেলে ১৫০ আসন পাবে, কোনো দল ১০% ভোট পেলে ৩০টি আসন পাবে ইত্যাদি।

খ. PR ব্যবস্থায় প্রতিটি রাজনৈতিক দল ইশতেহার ঘোষণার পাশাপাশি সংসদে আসন নেওয়ার জন্য তাদের দলের প্রতিনিধিদের তালিকা অগ্রাধিকারক্রম অনুসারে নির্বাচনের আগেই দেশবাসীকে জানিয়ে দেবে। নির্বাচনে প্রাপ্ত ভোট অনুসারে যে কয়টি আসন সেই দলের প্রাপ্য হবে, তালিকার ক্রমানুসারে সেই কয়জন ব্যক্তি সংসদ সদস্য হিসেবে গণ্য হবেন।

গ. PR ব্যবস্থা প্রবর্তিত হলে নির্বাচিত সংসদ সদস্যগণ স্থানীয় পর্যায়ের উন্নয়ন, প্রশাসনিক অথবা অন্য কোনো কাজের সাথে জড়িত থাকবেন না। তারা শুধু জাতীয় নীতি-নির্ধারণ, আইন প্রণয়ন, কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রীয়-প্রশাসনের কাজ-কর্ম তদারক করা ইত্যাদিতে জড়িত থাকবেন। স্থানীয় সব উন্নয়নমূলক ও প্রশাসনিক কাজ-কর্ম সেই এলাকার নির্বাচিত স্থানীয় সরকারের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হবে।

ঘ. বর্তমানে নির্বাচন যেভাবে কালো টাকার খেলা হয়ে উঠেছে, চজ ব্যবস্থায় তা অনেক কমে যাবে। এর প্রধান কারণ হলো, তখন জাতীয় নির্বাচন আর ব্যক্তিকেন্দ্রিক ও এলাকাভিত্তিক হবে না বিধায় এমপি জিতিয়ে আনার জন্য এখন যেভাবে নানা সুযোগ-সুবিধার প্রত্যাশায় নির্বাচনে একধরনের 'পুঁজি বিনিয়োগ' ঘটে থাকে, সেই অবস্থা খর্ব করা সহজতর হবে।

ঙ. ইউরোপের প্রায় সব দেশে, দক্ষিণ আমেরিকা ও আফ্রিকার বেশিরভাগ দেশে, জাপানে, অস্ট্রেলিয়ায় সংখ্যানুপাতিক প্রতিনিধিত্ব তথা চজ ব্যবস্থা অনুসরণ করা হয়। পার্শ্ববর্তী শ্রীলঙ্কা ও নেপালে এই ব্যবস্থার প্রচলন রয়েছে।

এ ধরনের নির্বাচনী ব্যবস্থায় কালো টাকা, পেশীশক্তির প্রভাব বন্ধ হবে। এ ব্যবস্থা পরোক্ষভাবে হলেও একটি জাতীয় সরকারে রূপ দিবে। জাতীয় সংহতি প্রতিষ্ঠিত হবে। যার ফলে সংসদ হবে কার্যকর ও প্রাণবন্ত। সংসদ বয়কট বন্ধ হবে, রাজপথের সহিংস আন্দোলন বন্ধ হবে। সংসদের ভেতর এবং বাহিরে একটি শান্তির আবহ সৃষ্টি হবে। রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের মধ্যে সুসম্পর্ক সৃষ্টি হবে। সংসদে যোগ্যতা ও মেধার প্রতিযোগিতা সৃষ্টি হবে।

৭. সার্বিক কল্যাণ প্রতিষ্ঠায় ধর্ম ও রাজনীতির সমন্বয়

ধর্মের আসল উদ্দেশ্য মানুষকে সৎপথে পরিচালনা করা। সৎকর্মে মানুষকে উদ্বুদ্ধ করা, অসৎ কর্ম থেকে মানুষকে বিরত রাখা। 'মানুষের কল্যাণে মানুষ' এ চেতনায় উদ্বুদ্ধ করাসহ দেশ, ধর্ম ও মানবতাবিরোধী কার্যকলাপ থেকে বিরত রাখাই ধর্মের উদ্দেশ্য। অপরপক্ষে রাজনীতির উদ্দেশ্যই হল মানুষের কল্যাণ করা। সমাজের অনাচার-অবিচার, জুলুম, নির্যাতন ও অনৈতিক কর্মকাণ্ড বন্ধ করা।

রাজনীতির সাথে ধর্মের সমন্বয় না হলে রাজনীতি হয় শোষণের হাতিয়ার। দুর্নীতিবাজ, সন্ত্রাসী, খুনি, বিদেশে টাকা পাচারকারী, ব্যাংকডাকাত ও ঋণখেলাপীরা কখনই ধার্মিক হতে পারে না। মানুষের জান-মালের নিরাপত্তাসহ সার্বিক মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা করা ধর্ম ও রাজনীতির উদ্দেশ্য। দুটি বিষয়ের উদ্দেশ্য একই, সেহেতু এ দু'টি বিষয়ের সমন্বয় ঘটানোর মাধ্যমেই প্রকৃত কল্যাণ অর্জন সম্ভব। সত্যিকার একজন ধার্মিক কখনোই মানুষের এবং দেশের অকল্যাণ করতে পারে না। কল্যাণরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় সকল ধর্মের মানুষের মাঝে ঐকমত্য প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

এ ব্যাপারে আমাদের অঙ্গীকার নিম্নরূপ-

ক. ধর্মের ব্যাপক প্রচার করা হবে এবং ধর্ম-কর্মে মানুষকে উদ্বুদ্ধ করা হবে। মানবতা বিরোধী সকল কার্যকলাপ থেকে বিরত রাখার জন্য ধর্মীয় অনুশাসন বাস্তবায়ন করা হবে।

খ. ধর্মের বিরুদ্ধে যাতে কেউ ব্যক্তিগতভাবে অথবা রাজনৈতিকভাবে কটুক্তি করতে না পারে সে ব্যাপারে আইন পাশ করা হবে এবং কটুক্তিকারীদের বিরুদ্ধে কঠোর শাস্তির বিধান করা হবে।

৮. রাজনৈতিক ও সাংবিধানিক কমিশন গঠন

কমিশন গঠনের উদ্দেশ্য :

ক. রাজনৈতিক দলগুলোর কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ।

খ. ক্ষমতাসীন দলের ইশতেহার পর্যালোচনা।

গ. নির্বাচন কমিশনের সামগ্রীক নির্বাচনী কার্যক্রম প্রক্রিয়া নিরীক্ষণ।

কমিশন যেভাবে গঠিত হবে :

সুপ্রীম কোর্টের আপিল বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত স্বনামধন্য একজন সাবেক প্রধান বিচারপতির নেতৃত্বে ৫ সদস্য বিশিষ্ট রাজনৈতিক ও সাংবিধানিক কমিটি গঠন করা হবে। কমিশন গঠনে সদস্য মনোনয়নের ক্ষেত্রে সততা, যোগ্যতা ও নিরপেক্ষতার মাপকাঠি বিবেচনা করা হবে।

কমিশনের কার্যক্রম নিম্নরূপঃ

ক. প্রত্যেক দলের গঠনতন্ত্র ও নেতা-কর্মীদের সামগ্রিক কার্যক্রম পর্যালোচনা করা। দলের মধ্যে যাতে দুর্নীতিবাজ, সন্ত্রাসী এবং সমাজবিরোধী লোক কোন পদ-পদবী না পায়, সেদিকে লক্ষ্য রাখা। প্রাথমিক পর্যায়ে দলকে সতর্ক করে দেওয়া। দল এ ব্যাপারে ব্যবস্থা না নিলে দলের নিবন্ধন বাতিলের জন্য নির্বাচন কমিশনে সুপারিশ করা।

খ. নির্বাচিত সরকারের নির্বাচনী ইশতেহার যাতে ফাঁকা বুলি ও বাস্তবতাবিবর্জিত না হয়, সেদিকে লক্ষ্য রাখবেন। ঘোষিত ইশতেহারে বর্ণিত ওয়াদা-অঙ্গীকার ও কর্মসূচি কতটুকু বাস্তবায়ন হচ্ছে; প্রতি ছয় মাস পর পর রিপোর্ট পেশ করবেন। যৌক্তিক সময়ের মধ্যে কর্মসূচি বাস্তবায়নের সমন্বয় হচ্ছে

কিনা তা পর্যালোচনা করবেন। যৌক্তিক সময়ে কর্মসূচি বাস্তবায়ন করতে ব্যর্থ হলে প্রাথমিক পর্যায়ে সরকারকে সতর্ক করবেন। সতর্ক করার পরেও যদি ওয়াদা-অঙ্গীকার এবং কর্মসূচি বাস্তবায়ন করতে না পারে, তবে সরকার ব্যর্থ বলে প্রেসিডেন্টের নিকট রিপোর্ট পেশকরতে না পারে, তবে সরকার ব্যর্থ বলে প্রেসিডেন্টের নিকট রিপোর্ট পেশ করবেন।

৯. শুধু আইনের শাসন নয়; ন্যায়ের শাসনও প্রতিষ্ঠা

সকল আইনেই যে মানুষের কল্যাণ হয়, মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা হয়, তার কোন নিশ্চয়তা নেই; বরং অনেক আইন আছে যা দমনমূলক, বাকস্বাধীনতা ও রাজনৈতিক স্বাধীনতা হরণ করে। অনেক আইন মানবাধিকার লংঘন করে। যেমন কালো আইন, স্বৈরশাসকের ঘোষিত দমনমূলক আইন, সরকারের অবৈধভাবে ক্ষমতায় টিকে থাকার আইন। এই সকল আইন প্রয়োগে মানবাধিকার চরমভাবে লংঘিত হয়। এ আইনে মানুষের জীবন দুর্বিষহ হয়ে ওঠে। খারাপ আইনে শাসন ও শাসনকর্তাও খারাপ হয়ে যায়। ন্যায়ভিত্তিক কল্যাণধর্মী আইনের দ্বারা দেশ পরিচালিত হলে দেশে মানবাধিকার প্রতিষ্ঠিত হবে। এ শাসন শান্তিময়। এ শাসন কল্যাণময়। এতে মানুষের জীবন সুখী ও নিরাপদ হয়। এজন্যই শুধু আইনের শাসন নয়; ন্যায়ের শাসন প্রতিষ্ঠা করাও আমাদের অন্যতম অঙ্গীকার।

১০. অবাধ, সুষ্ঠু ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচনের লক্ষ্যে ১৩ দফা

১. গ্রহণযোগ্য নির্বাচনের স্বার্থে সর্বোচ্চ আদালত কর্তৃক নির্বাচনকালীন পর্যবেক্ষণের ব্যবস্থা রাখা হবে। সর্বোচ্চ আদালতের পর্যবেক্ষণে নির্বাচন সুষ্ঠু প্রমাণিত না হলে নির্বাচনী ফলাফল বাতিলে সর্বোচ্চ আদালতের রায়ই চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে- মর্মে নির্বাচনী আইন সংযোজিত করা হবে।

২. প্রার্থীদের মনোনয়নপত্র পূরণে সহজিকরণ করা হবে এবং মনোনয়নপত্র অনলাইনে জমাদানের সুযোগ রাখা হবে।

৩. সৎ ও যোগ্য কিন্তু অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল প্রার্থীগণ যাতে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে পারেন– এজন্য নির্বাচনী ব্যয় কমানোর লক্ষ্যে জামানত এবং সিডি ক্রয় বাবদ সর্বোচ্চ ১০,০০০/- (দশ হাজার) টাকার মধ্যে সীমিত রাখা হবে। নির্বাচন কমিশনের তত্ত্বাবধানে একক পোস্টারে সকল প্রার্থীর নাম, দলের নাম ও মার্কা সম্বলিত পোস্টার ছাপানো এবং একই মঞ্চে যৌথভাবে জনসভার ব্যবস্থা করা হবে। পোস্টারে নাম এবং বক্তব্যের ক্রম বিন্যাস নির্বাচনে অংশগ্রহনকারী স্ব-স্ব দলের ক্রমানুযায়ী সাজানো হবে। এভাবে ব্যানার, ফেস্টুনও করা হবে। এজন্য প্রয়োজনীয় ব্যয় স্ব স্ব দল থেকে গ্রহণ করা হবে।

৪. সুষ্ঠু ও দলীয় প্রভাবমুক্ত নির্বাচনের লক্ষ্যে সংসদ সদস্য থাকা অবস্থায় কেউ নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে পারবেন না। তাই নির্বাচনের ৯০ দিন পূর্বেই বিদ্যমান সংসদ ভেঙ্গে দিয়ে গ্রহণযোগ্য নির্বাচনের পরিবেশ তৈরী করা হবে।

৫. বাংলাদেশে বিগত দিনে জাতীয় সংসদ নির্বাচনের ক্ষেত্রে দলীয় সরকারের চেয়ে নিরপেক্ষ সরকারের অধীনে নির্বাচন তুলনামূলভাবে সুষ্ঠু হয়েছে বিধায় অন্তর্বর্তীকালীন নিরপেক্ষ সরকার গঠনের উদ্যোগ নেওয়া হবে।

৬. দেশী-বিদেশী সাংবাদিক ও নির্বাচনী পর্যবেক্ষকদের ভোটগ্রহণ প্রক্রিয়া পর্যবেক্ষণে কোনরূপ বাঁধার সৃষ্টি না হয়, সে ব্যাপারে কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।

৭. গণমাধ্যমে ও মাঠপর্যায়ে প্রচার প্রচারণার সমান সুযোগসহ সকল দলের জন্য নির্বাচনী সুযোগ সুবিধা নিশ্চিত করার মাধ্যমে 'লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড' তৈরীর প্রয়োজনীয় আইনী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

৮. বাংলাদেশের ভোটারগণ ইভিএম পদ্ধতির সাথে সুপরিচিত না হওয়া পর্যন্ত ইভিএম পদ্ধতি স্থগিত রাখার আইন পাশ করা হবে।

৯. ভোটগ্রহণ শুরুর পূর্বে ভোটকেন্দ্রের মোট ব্যালট পেপারের সংখ্যা ও তার ক্রমিক নম্বর এবং শূন্য ব্যালটবাক্স সকল দলের পোলিং এজেন্ট এবং সাংবাদিকদের সামনে প্রকাশ করা হবে। ভোটগ্রহণ শেষে ব্যালট পেপারের ক্রমিক নম্বরের ভিত্তিতে কাস্টকৃত মোট ভোটসংখ্যা প্রকাশ করা হবে-মর্মে আইন পাশ করা হবে।

১০. গ্রহণযোগ্য নির্বাচনের লক্ষ্যে ভোটের সুষ্ঠু পরিবেশ বিনষ্টকারী ও জালভোট প্রদানকারী এবং নির্বাচন পরিচালনার কাজে নিয়োজিত কেউ পক্ষপাতমূলক আচরণ করলে তাদের যাবৎ জীবন শাস্তির আইন করা হবে। যাতে ভবিষ্যতে আর কেউ সুষ্ঠু নির্বাচনের পরিবেশ বিনষ্ট করার সাহস না পায়।

১১. প্রার্থীসহ নির্বাচনী কাজে নিয়োজিত সকলের প্রয়োজনীয় নিরাপত্তা নিশ্চিত করা হবে।

১২. ঝুঁকিপূর্ণ কেন্দ্রগুলোকে সি.সি. ক্যামেরার আওতায় আনা হবে।

১৩. কেন্দ্রভিত্তিক নির্বাচনী কাজে নিয়োজিত সদস্যগণের থাকা-খাওয়ার সু-ব্যবস্থা করা হবে। যাতে দলীয় কোন ব্যক্তির ছত্রছায়ায় থেকে খাওয়া দাওয়া করতে না হয়।

১১. কৃষিবিপ্লব ও কৃষকের অধিকার প্রতিষ্ঠায় ১৫ দফা

১. কৃষকের উৎপাদনব্যয় পুষিয়ে নেওয়ার স্বার্থে উন্নত সার, প্রয়োজনীয় সেচ ও উচ্চফলনশীল বীজ অর্ধেক মূল্যে সরবরাহ করা হবে।

২. কৃষিকাজে উদ্বুদ্ধ করার লক্ষ্যে বিনা সুদে ও সহজশর্তে কৃষকদের মাঝে প্রয়োজনীয় ঋণ বিতরণের উদ্যোগ নেওয়া হবে।

৩. অনাবাদী, খাসজমি দরিদ্র কৃষকদেরকে সহজশর্তে বরাদ্দ দিয়ে দারিদ্র্য দূরীকরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

৪. প্রাকৃতিক দুর্যোগ, বীজ ও কীটনাশকের ভেজালের কারণে ফসল ক্ষতিগ্রস্ত হলে কৃষককে ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হবে।
৫. কৃষিঋণ আদায়ের ক্ষেত্রে অযথা হয়রানী বন্ধ করা হবে। এ লক্ষ্যে কৃষকের সুবিধার্থে তামাদি আইন রহিত করা হবে।
৬. কৃষকের উৎপাদিত সবজি সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হবে।
৭. এলাকাভিত্তিক কৃষিপণ্য উৎপাদন জোন প্রতিষ্ঠা করে কৃষিনির্ভর শিল্প কারখানা গড়ে তোলা হবে।
৮. কৃষি সরঞ্জামাদির মূল্য কমানো এবং উৎপাদিত পণ্য ভোক্তাগণের কাছে দ্রুত পৌঁছে দিতে পরিবহনব্যবস্থা নিরাপদ রাখা হবে।
৯. উৎপাদিত কৃষিপণ্য ন্যায্যমূল্যে বিক্রয়ের জন্য সরকারের পক্ষ থেকে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।
১০. কৃষিবান্ধব আমদানী নীতি প্রণয়ন করা হবে।
১১. কৃষকদেরকে সম্মানিত নাগরিক হিসেবে রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি দেওয়া হবে।
১২. জাতীয় বাজেটে কৃষিতে সর্বোচ্চ বরাদ্ধ দেওয়া হবে।
১৩. কৃষকদের চিকিৎসা এবং তাদের সন্তানদের শিক্ষা ও পরিবহন ব্যয় অর্ধেক করা হবে।
১৪. কৃষক, কৃষি মজুরদের সার্বজনীন পেনশন স্কিমের আওতায় আনা হবে।
১৫. কৃষকদেরকে দক্ষ করে গড়ে তোলার জন্য কৃষি প্রযুক্তির ব্যবহারে স্বল্প মেয়াদী প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হবে।

১২. শিক্ষা

সৎ, চরিত্রবান, দক্ষ, আদর্শবান এবং বিভিন্ন বিষয়ে বিশেষজ্ঞ বানানোর শিক্ষাব্যবস্থা প্রণনয় করা হবে। শিক্ষা মানুষকে অন্ধকার থেকে আলোর পথ দেখায়। একটি আলোকিত ও সুসভ্য জাতি হিসেবে বিশ্বে সগৌরবে মাথা উঁচু করে দাঁড়ানোর লক্ষ্যে শিক্ষাকে আমরা সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেব। এমন শিক্ষাব্যবস্থা প্রণয়ন করব, যাতে একজন শিক্ষিত মানুষ নৈতিক, আদর্শিক, আধ্যাত্মিক, বিজ্ঞান-প্রযুক্তি ও সামরিকসহ বিভিন্ন পেশায় সর্বোচ্চ দক্ষতা অর্জন করতে পারে। প্রতিটি নাগরিককে সুশিক্ষিত হিসেবে গড়ে তুলতে আমরা নিম্নোক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করব−

ক. সৎ চরিত্রবান, দক্ষ ও আদর্শ নাগরিক গড়ে তোলার লক্ষ্যে গোটা শিক্ষা ব্যবস্থাকে নৈতিক মূল্যবোধ ও ধর্মীয় আদর্শের আলোকে ঢেলে সাজানো হবে এবং দেশের সকল নাগরিকের জন্য শিক্ষার অধিকার নিশ্চিত করা হবে।

খ. দরিদ্র, অসহায়, ইয়াতীম ও প্রতিবন্ধী ছেলে-মেয়েদের জন্যে সকল ক্ষেত্রে অবৈতনিক শিক্ষার সুযোগ দেয়া হবে এবং তাদের জন্যে উচ্চ শিক্ষার দ্বার উন্মোচন করা হবে।

গ. মসজিদ, মন্দির ও গীর্জাকেন্দ্রিক গণশিক্ষা কার্যক্রম জোরদার করা হবে এবং দেশের লক্ষ লক্ষ ইমাম মুয়াজ্জিনকে প্রশিক্ষণ দিয়ে গণশিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনায় নিযুক্ত করা হবে।

ঘ. নিবন্ধনকৃত বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় ও ইবতেদায়ী মাদরাসা শিক্ষকদের বেতন-ভাতা এমপিওভুক্ত করা হবে।

ঙ. মেয়েদের উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে সকল প্রকার হয়রানী ও প্রতিবন্ধকতা দূর করার লক্ষ্যে সকল পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়সহ সর্বত্র মেয়েদের জন্যে আলাদা ব্যবস্থাপনা গড়ে তোলা হবে এবং তাদের আলাদা পাঠদানে পর্যাপ্ত নারী শিক্ষক নিয়োগ দেওয়া হবে।

চ. কওমী মাদরাসাকে যথাযথ মূল্যায়ন করা হবে এবং প্রতিটি উপজেলায় উচ্চতর কওমী দীনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা হবে। শিক্ষকদেরকে দেশগঠন ও উন্নয়নের মূল স্রোতধারায় সম্পৃক্ত করার জন্যে যথাযথ উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে। কওমী মাদরাসা শিক্ষার মৌলিক বৈশিষ্ট্য ঠিক রেখে সিলেবাসকে যুগোপযোগী ও অভিন্ন করা হবে।

ছ. ছাত্র-ছাত্রীদেরকে নৈতিকতাসম্পন্ন আদর্শ ও সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত মৌলিক ধর্মীয় শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা হবে।

জ. গণমাধ্যমকে গণশিক্ষার কাজে ব্যবহার করা হবে।

১৩. কর্মসংস্থান ও দারিদ্র্য বিমোচন

বেকারত্ব আমাদের অন্যতম জাতীয় সমস্যা। ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ এই সমস্যা সমাধানে এবং দারিদ্র্য দূরিকরণে নিম্নোক্ত উদ্যোগ গ্রহণ করবে–

ক. কর্মসংস্থান ও দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে ইসলামের অন্যতম স্তম্ভ ও অর্থনৈতিক বিধান যাকাতব্যবস্থাকে যথাযথভাবে স্বাবলম্বীকরার কাজে লাগানো হবে।

আমরা হিসাব করে দেখেছি, যথাযথ প্রক্রিয়ায় রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে সরকারি ও বেসরকারিভাবে যাকাত আদায় করা হলে প্রতি বছর প্রায় ৩০ লক্ষ পরিবার তথা দেড় কোটি দরিদ্র মানুষকে দারিদ্রমুক্ত করে স্বাবলম্বী করা সম্ভব। এ প্রক্রিয়ার শুধু যাকাতের বিধান প্রয়োগের মাধ্যমেই মাত্র ১০ বছরের মধ্যে সম্পূর্ণ দারিদ্র্যমুক্ত বাংলাদেশ গড়ে তোলা সম্ভব।

খ. শিক্ষিত বেকার যুবশক্তির কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে ক্ষুদ্রশিল্প, ক্ষুদ্র ব্যবসা ও কৃষি খামার গড়ে তোলার জন্যে প্রত্যেক তফসিলি ব্যাংকে 'করজে হাসানা' বিভাগ খোলা হবে। এই বিভাগ থেকে শুধু সার্ভিস চার্জ গ্রহণ করে সহজ শর্তে শিক্ষিত বেকার যুবশক্তিকে ঋণ প্রদান করা হবে।

জাতীয় বাজেটে 'করজে হাসানা' খাতে একটি বরাদ্দ রাখা হবে এবং ইসলামের একটি ফযীলতপূর্ণ সুন্দর বিধান করজে হাসানা ফান্ডে টাকা জমা রাখার জন্যে হৃদয়বান বিত্তশালীদেরকে উদ্বুদ্ধ করা হবে।

গ. শিক্ষিত এবং স্বল্পশিক্ষিত বেকার জনশক্তিকে রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনায় প্রশিক্ষণ প্রদান করে মধ্যপ্রাচ্যসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে কর্মসংস্থান সৃষ্টির উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে।

ঘ. 'কাজের বিনিময়ে খাদ্য' কর্মসূচিকে আরো কার্যকরী ও ব্যাপকতর করা হবে। এর সাথে 'শিক্ষার বিনিময়ে খাদ্য' কর্মসূচিও চালু করা হবে।

১৪. ভিক্ষুক পুনর্বাসন

ভিক্ষাবৃত্তি একটি জাতীয় অভিশাপ। মহানবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ভিক্ষাবৃত্তিকে অপছন্দ করতেন। ইসলাম ভিক্ষাবৃত্তিকে নিরুৎসাহিত করে। ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ এই জাতীয় অভিশাপ থেকে রক্ষার জন্যে ভিক্ষুকমুক্ত দেশ গড়ে তুলবে।

এ লক্ষ্যে বিকলাঙ্গ ভিক্ষুকদের পুনর্বাসন করা হবে এবং কর্মক্ষম ভিক্ষুকদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা হবে।

১৫. স্বাস্থ্য

ক. 'আরোগ্যের চেয়ে প্রতিরোধ ভাল' এ শ্লোগানের ভিত্তিতে জনসাধারণকে স্বাস্থ্যসচেতন করে তোলা হবে।

খ. সুস্বাস্থ্যের জন্য সুষম খাদ্যের গুরুত্ব সম্পর্কে জনগণকে সচেতন করা হবে।

গ. আন্তর্জাতিক মানের চিকিৎসা পদ্ধতি চালু করা হবে।

ঘ. প্রত্যেক জেলায় ও উপজেলায় অবস্থিত হাসপাতালসমূহের চিকিৎসা ও খাবারমান উন্নত করা হবে।

ঙ. চর, দীপাঞ্চল, পাহাড়ী অঞ্চল এবং করিডোর অঞ্চলে উন্নত চিকিৎসাসেবার ব্যবস্থা করা হবে।

চ. ইউনিয়ন পর্যায়ে উন্নত স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স প্রতিষ্ঠা করে এমবিবিএস ডাক্তারের তত্ত্বাবধানে পরিচালনা করা হবে।

ছ. জাতীয় ঔষধনীতি সময়োপযোগী করা হবে। কমমূল্যে মানসম্পন্ন ঔষধ তৈরি করার ব্যবস্থা করা হবে।

জ. বিকল্প চিকিৎসাপদ্ধতি যথা- হোমিওপ্যাথী, আয়ুর্বেদিক, ইউনানী বা কবিরাজী চিকিৎসা বিজ্ঞানকে আরও উন্নত ও মানসম্মত করা হবে।

১৬. অর্থনীতি

ক. যাকাতভিত্তিক অর্থনীতি চালু করে দেশ থেকে দারিদ্য দূর করা হবে।

খ. দেশের অর্থনীতিকে গতিশীল করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে। দেশের অঞ্চলে অঞ্চলে সৃষ্ট অর্থনৈতিক বৈষম্য হ্রাস করার কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে।

গ. শিল্পঋণ সহজলভ্য এবং নতুন শিল্প স্থাপন করা হবে।

ঘ. বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ বৃদ্ধির জন্য সর্বাত্মক উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে।

ঙ. বিদেশে বসবাসকারী বাংলাদেশীদের দেশে অর্থ প্রেরণে উৎসাহিত ও সহজতর করা হবে।

চ. বিদেশী বিনিয়োগ আকৃষ্ট করা হবে এবং পুঁজিবাজারে আস্থা ফিরিয়ে এনে ক্ষুদ্র বিনিয়োগ সম্প্রসারিত করার অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করা হবে।
ছ. দেশের অনুন্নত অঞ্চলে বিশেষত উত্তরবঙ্গে শিল্পায়ন, বিদেশী পুঁজি বিনিয়োগ ও ব্যাংক ঋণের বিশেষ সুবিধা প্রবর্তন করা হবে।
জ. কর প্রদানে সকল স্বচ্ছল নাগরিকদের উৎসাহিত করা হবে।

১৭. জ্বালানী ও বিদ্যুৎ

ক. পল্লী বিদ্যুতায়ন কর্মসূচি সম্প্রসারিত করে ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ পৌঁছানোর উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে।
খ. চাহিদা অনুযায়ী সারাদেশে বিদ্যুৎ উৎপাদন নিশ্চিত করা হবে।
গ. রাজধানী ঢাকায় যাতে বিদ্যুৎ ঘাটতি না হয়, সে লক্ষ্যে রাজধানীর জন্য আলাদা বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র স্থাপন করা হবে।
ঘ. গ্যাস সরবরাহ সম্প্রসারণের বাস্তবমুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।
ঙ. দেশের স্বার্থ বিবেচনা করে সার্বজনীন জ্বালানী নীতি প্রণয়ন করা হবে।
চ. পারমাণবিক বিদ্যুৎ উৎপাদনকেন্দ্র সম্প্রসারণে উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে।
ছ. বে-সরকারী বিদ্যুৎ প্লান্ট স্থাপনে উৎসাহ এবং সহযোগিতা দেওয়া হবে।
জ. সৌর বিদ্যুৎ উৎপাদন প্রক্রিয়া সম্প্রসারণ করা হবে।

১৮. আইন ও বিচার

ক. কুরআন-সুন্নাহ্ ও শরীয়াবিরোধী কোন আইন পাশ করা হবে না এবং বিদ্যমান কুরআন-সুন্নাহবিরোধী আইন সংশোধন করা হবে।
খ. রাষ্ট্রের কর্ণধার থেকে শুরু করে একজন সাধারণ নাগরিক পর্যন্ত সবাই আইনের চোখে সমান– খোলাফায়ে রাশেদীনের এই নীতি অনুসরণ করা হবে।
গ. বিচার বিভাগ সম্পূর্ণভাবে স্বাধীন ও পক্ষপাতহীনভাবে গড়ে তোলা হবে।
ঘ. বিশেষ ক্ষমতা আইন, জননিরাপত্তা আইনসহ সকল কালো কানুন বাতিল করা হবে।
ঙ. বিনা বিচারে কাউকে কারাবন্দী করা হবে না এবং সকল বিচারকার্য দ্রুত নিষ্পত্তি করা হবে।
চ. স্বীকারোক্তি আদায়ের জন্য কোন নাগরিককে নির্যাতন করা হবে না।
ছ. বিচারক নিয়োগের ক্ষেত্রে সততা-যোগ্যতা এবং দলনিরপেক্ষতাকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেওয়া হবে।
জ. দেশের সকল নাগরিকের জন্য ন্যায়বিচার প্রাপ্তির সুযোগ সহজ করা হবে।

১৯. শান্তি-শৃঙ্খলা-নিরাপত্তা

ক. দেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব ও জাতীয় নিরাপত্তাবিধানকল্পে সশস্ত্র বাহিনীকে শক্তিশালী করা হবে।

খ. জনসংখ্যার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হারে পুলিশের সংখ্যা বাড়ানো এবং পুলিশ বাহিনীকে আধুনিকীকরণ করা হবে। পুলিশের মানসম্মত বেতন-ভাতা এবং সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি করা হবে।
গ. সেনাবাহিনীকে দেশরক্ষার সাথে সাথে দেশের উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত করা হবে।
ঘ. বিজিবি-কে শক্তিশালী করা হবে এবং সীমান্ত সুরক্ষায় সর্বোচ্চ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
ঙ. আনসার ও ভিডিপি'র বেতন ও সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি করা হবে এব তাদের আরো ক্ষমতা প্রদান করা হবে।

২০. গ্রামীণ উন্নয়ন

ক. প্রতিটি উপজেলায় প্রয়োজনীয় গুচ্ছগ্রাম প্রতিষ্ঠা করে সেখানে ভূমিহীন, ঠিকানাবিহীন মানুষকে পুনর্বাসিত করা হবে। উপজেলার উন্নয়ন কাজে সম্পৃক্ত করে তাদের আয়ের ব্যবস্থা করা হবে।
খ. পল্লী রেশন চালু করা হবে।
গ. প্রতি ইউনিয়নে উন্নতমানের ইউনিয়ন পরিষদ কমপ্লেক্স নির্মাণ করা হবে। এতে কমিউনিটি সেন্টার সুবিধা থাকবে।

২১. যোগাযোগব্যবস্থার উন্নয়ন ও আধুনিকায়ন

ক. দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনার আলোকে সড়ক, রেল, নৌ ও বিমান যোগাযোগব্যবস্থা আধুনিকায়ন ও নিরাপদ করা হবে।
খ. দরিদ্র্য জনগণের যাতায়াত ও পণ্য পরিবহনের স্বার্থে, সড়ক, রেল ও নৌপথকে অধিক গুরুত্ব প্রদান করা হবে।
গ. গোটা দেশে সুষমভাবে যোগাযোগব্যবস্থার উন্নয়ন করা হবে এবং তুলনামূলকভাব অবহেলিত উপকূলীয় দক্ষিনাঞ্চল ও মঙ্গাপ্রবণ উত্তরাঞ্চলে উন্নত যোগাযোগ অবকাঠামো গড়ে তোলা হবে।
ঘ. হজ্জ গমনিচ্ছুগণ যাতে তুলনামূলক কম খরচে হজ্জ করতে পারেন, সেজন্যে সমুদ্রপথে জাহাজযোগে হজ্জ পালন করার ব্যবস্থা করা হবে।
ঙ. ডাক, তার ও টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থাকে আধুনিকায়ন করে লাভজনক খাতে পরিণত করা হবে।

২২. বিজ্ঞান ও তথ্য প্রযুক্তি

ক. কৃষি-শিল্প, যোগাযোগ, চিকিৎসা ও দৈনন্দিন জীবনে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সুফল গ্রহণ করতে দেশে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির নব নব উদ্ভাবনে গুরুত্ব দেওয়া হবে।
খ. বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ক্ষেত্রে অনুসরণ ও অনুকরণ নয়; বরং নিজস্ব উদ্ভাবনী প্রতিভা সৃষ্টিতে পরিকল্পিতভাবে প্রাথমিক স্তরে এবং পরবর্তীতে বিষয়ভিত্তিক মেধা যাচাই করে মৌলিক বিজ্ঞান চর্চায় কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

গ. বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিখাতে সরকারি-বেসরকারি বিনিয়োগ বৃদ্ধি করা হবে এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিষয়ক শিল্প স্থাপনে বিশেষ সহায়তা প্রদান করা হবে।
ঘ. তথ্য-প্রযুক্তির ক্ষতিকর দিক সম্পর্কে গোটা বিশ্ব আজ সচেতন। সেজন্য তথ্য-প্রযুক্তির বিদ্যমান ব্যবস্থাকে পুনর্বিবেচনা করে এর ক্ষতিকর দিকগুলো বন্ধ করা হবে।
ঙ. ইন্টারনেটের সকল ক্ষতিকর ওয়েবসাইট বন্ধ করা হবে।
চ. তথ্য প্রযুক্তিতে দক্ষ মানবসম্পদ গঠন, সাইবার নিরাপত্তা, তথ্য- প্রযুক্তিগত নিত্য-নতুন ধারণার কার্যকরী সমন্বয় সাধন, যথাযথ তথ্য-প্রযুক্তি সার্ভিস নিশ্চত করা হবে।

২৩. পররাষ্ট্রনীতি

ক. জাতীয় স্বার্থ ও স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব বজায় রেখে বিশ্বের সকল দেশের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপন করে পররাষ্ট্রনীতির একটি রোল মডেল স্থাপণ করা হবে।
খ. সাম্রাজ্যবাদ, সম্প্রসারণবাদ, আধিপত্যবাদ, সন্ত্রাসবাদ ও সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাসহ সকল আগ্রাসী তৎপরতার মোকাবেলায় দুনিয়ার সকল মজলুম জাতির পক্ষাবলম্বন করা হবে।
গ. প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলোর সাথে সম-মর্যাদা রক্ষা করা, কারো অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ না করা এবং সু-সম্পর্কের ভিত্তিতে সহ-অবস্থানের নীতি গ্রহণ করা হবে।
ঘ. পারস্পরিক আলাপ-আলোচনা এবং ন্যায় ও ইনসাফের ভিত্তিতে দ্বি-পাক্ষিক ও আঞ্চলিক সমস্যার সমাধান করা হবে।
ঙ. মুসলিম বিশ্বের সংহতি ও উন্নয়নের জন্য নিম্নোক্ত পদক্ষেপ নেয়া হবে–
মুসলিম উম্মাহর সংহতি জোরদার করার লক্ষ্যে ইসলামী সভ্যতার পুনরুজ্জীবন ও উন্নয়ন, ইসলামী সংস্কৃতির প্রসার ঘটানো, যৌথ সংবাদ সংস্থা, যৌথ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা, যৌথ মুদ্রা এবং মুসলিম জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠায় অগ্রণী ভূমিকা পালন করা হবে।

২৪. শিল্প ও বাণিজ্য

ক. ব্যাপক কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির লক্ষ্যে সরকারী ও বেসরকারী উদ্যোগে নতুন শিল্প কারখানা গড়ে তোলা হবে এবং বিদেশী ও প্রবাসীদের বিনিয়োগের পরিবেশ তৈরী করা হবে।
খ. শিল্পোদ্যোক্তাদের প্রয়োজনীয় ঋণ, গ্যাস, বিদুৎ, পানি, স্যুয়ারেজ, আমদানী-রফতানী কার্যক্রমে ওয়ানস্টেপ সার্ভিস কর্মসূচি গ্রহণ করে স্বল্প সময়ের মধ্যে সকল সমস্যার সমাধান করা হবে।
গ. গার্মেন্টস শিল্প রক্ষা ও বিকাশে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেওয়া হবে।
ঘ. জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে বিসিক শিল্পনগরী গড়ে তোলার ব্যবস্থা করা হবে।
ঙ. আমদানীনির্ভরতা কমিয়ে নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্য দেশে উৎপাদনের ব্যবস্থা করা হবে।
চ. প্রয়োজনীয় খাদ্যদ্রব্য আমদানীতে শুল্ক লাঘব করা হবে।
ছ. বাণিজ্য ঘাটতি কমিয়ে আমদানী রপ্তানীতে ভারসাম্য আনার চেষ্টা করা হবে।

জ. শিল্পরক্ষা ও বিকাশে এবং মালিক-শ্রমিক সম্পর্ক উন্নয়নে কার্যকরী উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে।
ঝ. যে কোন হারাম পণ্য আমদানী-রফতানী নিষিদ্ধ করা হবে।

২৫. মুক্তিযোদ্ধাদের কল্যাণ এবং মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বাস্তবায়ন

ক. শোষণ-বঞ্চনার অবসান ঘটিয়ে শ্রেণী বৈষম্যহীন ও দারিদ্র্যমুক্ত কল্যাণরাষ্ট্র গড়ে তোলার মাধ্যমে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বাস্তবায়ন করা হবে।
খ. মুক্তিযোদ্ধাদের সন্তানদের চাকুরী প্রদানে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।
গ. পঙ্গু ও যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধাদের সম্মানীভাতা বাড়ানো হবে।
ঘ. মুক্তিযোদ্ধাদের চিকিৎসাব্যয়, পরিবহনের ভাড়া, তাদের ছেলেমেয়েদের শিক্ষার যাবতীয় ব্যয়ভার রাষ্ট্রীয়ভাবে বহন করা হবে।

২৬. শিশু-কিশোর কল্যাণ

ক. কন্যাশিশু লালন-পালনে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অধিকতর উৎসাহ প্রদান করেছেন। এ লক্ষ্যে কন্যাশিশুর প্রতি পরিবার ও সমাজে যাতে কোনরকম অবহেলা বা বৈষম্য করা না হয়, এ ব্যাপারে ব্যাপক গণ-সচেতনতা সৃষ্টি করা হবে।
খ. শিশুশ্রম বন্ধে কার্যকরী উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে এবং পথশিশুদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা হবে। ইয়াতীম ও অসহায় প্রতিবন্ধী শিশুদের সম্পূর্ণ দায়িত্ব বহন করা হবে।
গ. শিশুদের শারীরিক, মানসিক ও নৈতিকভাবে সুগঠনে কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। শিশুখাদ্য ও শিশুপাঠ্য যাতে নির্ভেজাল হয়, তা সুনিশ্চিত করা হবে।
ঘ. পর্যায়ক্রমে শিশুদের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে ব্যবহার, প্রলোভন ও জোরপূর্বক জড়িত করা যাবে না।

২৭. প্রতিবন্ধীদের কল্যাণ

ক. প্রতিবন্ধী কল্যাণে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেওয়া হবে। প্রতিবন্ধী আইন যুগোপযোগী করে বাস্তবায়িত করা হবে।
খ. প্রতিবন্ধী মানুষের শিক্ষা, কর্মসংস্থান, চলাফেলা, যোগাযোগ ও চিকিৎসা সহজ করা হবে।
গ. তাদের মানবিক ও সামাজিক মর্যাদা প্রতিষ্ঠার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
ঘ. প্রতিবন্ধী মানুষের জন্য প্রতি জেলায় বিশেষ হাসপাতাল নির্মাণ করা হবে।
ঙ. গরীব প্রতিবন্ধী মানুষকে স্বাবলম্বী করার জন্য সর্বাত্মক চেষ্ঠা করা হবে।

২৮. অমুসলিম নাগরিকদের অধিকার ও নিরাপত্তা

ক. ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ অমুসলিম সম্প্রদায়ের সকল প্রকার নাগরিক অধিকার, মর্যাদা ও নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করবে।

খ. হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিস্টানসহ আপরাপর সকল অমুসলিম সম্প্রদায়ের জান-মাল ও ইজ্জতের নিরাপত্তা বিধানে কোনরকম বৈষম্য ও শৈথিল্য করা হবে না। তাদের ধর্মীয়, সামাজিক, রাজনৈতিক ও মানবিক অধিকার পুরোপুরি সুরক্ষা করা হবে।

গ. সকল উপজাতীয় অধিবাসীর স্বতন্ত্র জাতিসত্তার স্বীকৃতি দেওয়া হবে এবং তাদের শিক্ষা-সংস্কৃতি ও নিজস্ব ঐতিহ্যকে সুরক্ষা করা হবে।

ঘ. সকল অনগ্রসর জাতি-গোষ্ঠীকে শিক্ষা-চাকুরী ও যাবতীয় নাগরিক সুযোগ-সুবিধা প্রদানের বিশেষ ব্যবস্থা করা হবে।

ঙ. সকল ধর্মের নাগরিকদের মাঝে সৌহার্দ্যপূর্ণ সুসম্পর্ক গড়ে তোলা হবে এবং যেকোন ধরনের সাম্প্রদায়িক উসকানি ও সংঘাত কঠোরভাবে দমন করা হবে।

চ. সকল ধর্মের নাগরিকদের ধর্মীয় শিক্ষা গ্রহণ ও নিজস্ব সংস্কৃতি চর্চার সুযোগ প্রদান করা হবে।

২৯. নারী অধিকার ও ক্ষমতায়ন

১. নারীর ক্ষমতায়ন ও অগ্রাধিকার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে নতুন নীতিমালা প্রণয়ন করা হবে।

২. নারী নির্যাতন ও যৌতুকপ্রথা উচ্ছেদে শুধু আইনের যথাযথ প্রয়োগই নয় বরং সামাজিকভাবেও প্রতিরোধ গড়ে তোলা হবে।

৩. শিক্ষা ও কর্মক্ষেত্রে শালীন নারীসমাজের নিরাপত্তা ও সম্মান সুরক্ষায় কঠোর আইন তৈরি করা হবে।

৪. নারীদের অবমাননা, সামাজিক অবক্ষয় ও এইডস প্রতিরোধে পতিতাবৃত্তি, ব্যভিচার ও লিভ-টুগেদার নিষিদ্ধ করা হবে। নারীর জন্য অবমাননাকর এবং ধর্মীয়, সামাজিক ও নৈতিকভাবে অগ্রহণযোগ্য– এমন বাণিজ্যিক প্রদর্শনী ও ব্যবহার থেকে নারীসমাজকে বিরত রাখা হবে।

৫. স্বামীর উপর স্ত্রীর অধিকার এবং বাবা-মা ও স্বামীর সম্পত্তিতে নারীর শরীয়তসম্মত উত্তরাধিকার সুনিশ্চিত করা হবে। সন্তানের উপর মায়ের অধিকার ও দায়িত্বানুভূতি জাগিয়ে তোলা হবে।

৬. প্রত্যেক গর্ভবতী নারীর প্রসবকালীন চিকিৎসা ও গাইনী সেবা সুনিশ্চিত করা হবে।

৭. গার্মেন্টস-এ কর্মরত বিশাল নারী শ্রমিকদের নিরাপত্তা, আবাসন ও পরিবহন সংকট নিরসনে কার্যকরী উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে।

৮. যে সকল শিল্পকারখানায় নারী শ্রমিক কর্মরত থাকবে সেখানে 'চাইল্ড কেয়ার হোম' স্থাপন করা হবে।

৯. কর্মক্ষেত্রে নারীর নিরাপত্তা, কর্মবান্ধব পরিবেশ ও সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করা হবে।

৩০. ক্রীড়া ও সংস্কৃতি

ক. বাংলাদেশের জনগণ ইসলামী ভাবধারায় উজ্জীবিত একটি গতিশীল সংস্কৃতির ধারা লালন করে আসছে। আমাদের সাংস্কৃতিক এই ঐতিহ্য রক্ষা করে জাতিকে সংস্কৃতিমনা হিসেবে গড়ে তোলা হবে।

খ. রেডিও ও টেলিভিশনের মতো শক্তিশালী গণমাধ্যমকে নৈতিক শিক্ষা ও মনুষ্যত্ব বিকাশের মাধ্যম হিসেবে গড়ে তোলা হবে।

গ. ইসলামী মূল্যবোধের পরিপন্থী নয়–এমন সকল ক্রীড়া ও শিল্পকলা বিকাশের পূর্ণ সুযোগ দেওয়া হবে।

৩১. রাজনৈতিক ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠা

ক. রাজনৈতিক সংঘাত, হানাহানি নিরসনকল্পে আন্তঃদলীয় সংলাপ অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করা হবে।

খ. প্রতিহিংসার রাজনীতি পরিহার করে পারস্পরিক সহনশীল হওয়ার জন্য রাজনৈতিক দলসমূহকে উদ্বুদ্ধ করা হবে।

গ. বিভিন্ন ধর্মের মধ্যে সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে আন্তঃধর্মীয় সংলাপের ব্যবস্থা করা হবে।

ঘ. স্ব-স্ব ধর্ম পালনে কেউ যাতে কারও ধর্মীয় কর্মকাণ্ডে বাধার সৃষ্টি করতে না পারে, তার ব্যবস্থা করা হবে।

৩২. পরিবেশ

ক. পরিবেশ সংরক্ষণের এবং পরিবেশ দূষণ নিরসণের ক্ষেত্রে পরিবেশগত ভারসাম্য রক্ষার ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

খ. অবাধে গাছ কাটা এবং পাহাড় কাটা বন্ধ করা হবে।

গ. প্রতিটি বাড়িতে বছরে কমপক্ষে ১০টি বৃক্ষ রোপনে উৎসাহিত করা হবে।

ঘ. বুড়িগঙ্গাসহ সকল খাল ও নদীকে দূষণ ও দখলমুক্ত করা হবে।

৩৩. দেশবাসীর প্রতি আহ্বান

আমরা একটি গৌরবান্বিত দুর্দমনীয় জাতি। এ জনপদের মানুষ কখনও জালিম স্বৈরাচারের সাথে আপস করেনি। স্বৈরাচার যতই শক্তিশালী হোকনা কেন, তার রক্ত চক্ষুকে কখনো ভয় পায়নি এদেশের বীর জনতা। পলাশী থেকে স্বাধীনতা যুদ্ধ এবং এর পরবর্তী সময় পর্যন্ত আন্দোলন সংগ্রামে পিছপা হয়নি এদেশের মুক্তকামী মানুষ। এদেশে যখনই স্বৈরাচারের আবির্ভাব হয়েছে, তখনই জনগণ সম্মিলিতভাবে স্বৈরাচারের বিষদাঁত ভেঙ্গে দিয়েছে।

বাংলাদেশ বিশ্বের মধ্যে অন্যতম প্রাকৃতিক সমৃদ্ধশালী দেশ। এদেশে সর্বক্ষেত্রে প্রাকৃতিক সম্মদের প্রাচুর্য্য থাকা সত্ত্বেও শুধু নেতা ও নীতির ব্যর্থতার কারণে বিশ্বের দরবারে বাংলাদেশের ভাবমর্যাদা দিন দিন ক্ষুণ্ন হচ্ছে।

এ অবস্থা থেকে উত্তরণের জন্য আমাদের ঐক্যবদ্ধ উদ্যোগ প্রয়োজন। প্রয়োজন ভালো নেতা ও ভালো নীতির। আমাদের ভাগ্য পরিবর্তনে আমাদেরকেই এগিয়ে আসতে হবে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ পাক বলেন– নিশ্চয়ই আল্লাহ কোন জাতির ভাগ্য ততক্ষণ পরিবর্তন করেন না; যতক্ষণ না তারা নিজেরা নিজেদের ভাগ্য পরিবর্তন করে। তেতুল গাছ লাগিয়ে যেমন আমের আশা করা যায় না, তেমনই খারাপ লোককে নির্বাচিত করে দেশ ও জাতির কোনো কল্যাণের আশাও করা যায় না।

বিগত সরকারগুলোর শাসনামলে দেশে যে বিপর্যয় নেমে এসেছে, তা থেকে দেশ ও জাতিকে মুক্ত করার লক্ষ্যে ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। আমরা বাংলাদেশকে উন্নত ও কল্যাণরাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠা এবং জনগণের সেবায় সর্বদা নিয়োজিত থাকবো ইনশাআল্লাহ।

এতএব দেশবাসীর প্রতি আমাদের উদাত্ত আহ্বান– ৩০ ডিসেম্বর ২০১৮ ইং, রবিবার অনুষ্ঠিতব্য একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ মনোনীত প্রার্থীদেরকে হাতপাখা প্রতীকে আপনাদের মূল্যবান ভোট প্রদান করুন এবং জয়যুক্ত করে দুর্নীতি, দুঃশাসন, সন্ত্রাস, মাদকমুক্ত উন্নত ও কল্যাণরাষ্ট্র গড়ে তুলে মানবতার সার্বিক মুক্তির পথ প্রশস্ত করুন।

আল্লাহ দেশ ও জাতির সহায় হোন। আমীন।

বাংলাদেশ - জিন্দাবাদ
ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ - জিন্দাবাদ

ভালো নেতা ও নীতি চাই
এছাড়া জাতির মুক্তি নাই
–পীর সাহেব চরমোনাই

দুর্নীতি, দুঃশাসন, সন্ত্রাস, মাদকমুক্ত, উন্নত ও কল্যাণরাষ্ট্র গঠন করে জনগণকে যে সব নাগরিক সুবিধা দেওয়া হবে তা নিম্নরূপ

১. স্বাচ্ছন্দে ক্রয়ের জন্য খাদ্যমূল্য স্বাভাবিক মূল্যের চেয়ে ২০% কমানো হবে।

২. জীবনকে স্বাচ্ছন্দময় করে তোলা এবং শিল্প উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষে জ্বালানী তেল, গ্যাস ও বিদ্যুতের দাম ৩০% কমানো হবে।

৩. মানবিক কারণে রিক্সা, ভ্যান ও ঠেলাগাড়ীর লাইসেন্স ফি মওকুফ করা হবে।

৪. বাস, ট্রাক, মাইক্রোবাসসহ সকল গণপরিবহনের লাইসেন্স ফি অর্ধেক করা হবে।

৫. জমির খাজনা, সকল ধরণের টোল এবং হোল্ডিং ট্যাক্স ৩০% কমানো হবে।

৬. কৃষকের উৎপাদন খরচ পুষিয়ে নেওয়ার স্বার্থে সার, সেচ ও বীজ অর্ধেক মূল্যে দেওয়া হবে।

৭. শ্রমিকদের জীবনমান উন্নয়নের জন্য তাদের বেতন দ্বিগুণ করা হবে।

৮. সবার জন্য স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করার লক্ষে চিকিৎসাব্যয় ৫০% কমানো হবে।

৯. চলাচলের সহজলভ্যতার জন্য সকল সেক্টরের পরিবহন ভাড়া ৩০% কমানো হবে।

১০. সকল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে জাতীয়করণ করা হবে।

১১. শিক্ষার্থীরা পড়াকালীন সময়ে যাতে পুঁজি সঞ্চয় করে স্বাবলম্বী হতে পারে; এ লক্ষ্যে সকল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে স্টুডেন্ট সেভিংস ব্যাংক (SSB) গঠন করা হবে।

১২. সকল মসজিদের ইমাম, মোয়াজ্জিন এবং খাদেমকে সম্মানজনক ভাতা দেওয়া হবে।

১৩. সকল মন্দির ও গীর্জাসহ সকল প্রতিষ্ঠানের প্রধান এবং সেবককে সম্মাজনক ভাতা দেওয়া হবে।

১৪. আয়কর ও ভ্যাট ৩০% কমানো হবে।

১৫. আমদানী ও রফতানী শুল্ক ৩০% কমানো হবে।

১৬. ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হবে এবং লোডশেডিং বন্ধ করা হবে।

১৭. সর্বত্র আর্সেনিকমুক্ত বিশুদ্ধ পানির ব্যবস্থা করা হবে।

১৮. টেকসই ও গ্যারান্টি সহকারে রাস্তাঘাটসহ সকল অবকাঠামো নির্মাণ করা হবে।

১৯. রাস্তা-ঘাট এবং ফেরীতে সকল ধরণের অবৈধ চাঁদা ও টোকেন মানি বাতিল করা হবে।

২০. দেশীয় এবং বৈদেশিক ঋণ ১৫ বছরের মধ্যে শূন্যের কোঠায় আনা হবে।

২১. সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীর বেতন ২৫% বাড়ানো হবে।

প্রকাশনায়

প্রচার ও প্রকাশনা বিভাগ
ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ
৫৫/বি, পুরানা পল্টন, ঢাকা-১০০০
ফোন : ৯৫৬৭১৩০
web : www.islamiandolanbd.com
email: islamicandolanbd@gmail.com
facebook : www.facebook.com/iab87